গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭০ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ১ - ৭ ডিসেম্বর ২০১৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান নভেম্বর বিপ্লবের আহ্বান অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য

১৭ নভেম্বরের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তির সমাবেশে ১৭ নভেম্বর কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ। প্রকাশের আগে কমরেড প্রভাস ঘোষ নিজেই ভাষণটির প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছেন।

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ, ১৭ নভেম্বর

কমরেড প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশের আমন্ত্রিত আমাদের পরম বন্ধু কমরেড বাসদ (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক, কমরেডস ও বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং-এর সুযোগ্য ছাত্র এবং উত্তরসাধক, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ, এ দেশে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য আমরা যাতে মহান নভেম্বর বিপ্লবের পথ অনুসরণ করি এবং বিশ্বে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকাকে সগৌরবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি, এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টিকে কঠিন ও কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই নভেম্বর বিপ্লব, তার শতবার্ষিকী উদযাপন আমাদের কাছে অত্যন্ত আবেগের, তাৎপর্যের ও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি গত বছরের ৭ নভেম্বর দিল্লিতে মবলংকর হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করে এক বছরব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই একটি বছর ধরে আমাদের হাজার হাজার কমরেড ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে গ্রামে-শহরে-কলকারখানায়-অফিসে-নানা প্রতিষ্ঠানে-পাড়ায় পাড়ায় শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুবক-মহিলা সমাবেশ করে এই নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ নভেম্বর বিপ্লব এক মহান সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল। ৭০ বছর তার অস্তিত্ব ছিল। গত প্রায় ৩০ বছর তার অস্তিত্ব নেই। 'নভেম্বর বিপ্লব' এই শব্দটাই বিশ্বের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তদের বুকে কাঁপন ধরায়। তাই তারা চেয়েছে, ষড়যন্ত্র করেছে, ইতিহাস থেকে নভেম্বর বিপ্লবকে মুছে ফেলতে, নভেম্বর বিপ্লবের গরিমাকে কালিমালিপ্ত করতে। এখনকার প্রজন্মের অনেকেই জানে না এই ঐতিহাসিক সমাজবিপ্লবের কাহিনী। এই অবস্থায় আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত আনন্দের এবং প্রেরণাদায়ক— গোটা ভারতবর্ষে প্রচার করে আমরা দেখেছি নভেম্বর বিপ্লবের বার্তা অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য। আজকের এই বিশাল সমাবেশও তা প্রমাণ করে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আপনারা যারা এসেছেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে, প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে, এ রাজ্যের

দুয়ের পাতায় দেখুন

আগামী শিক্ষাবর্ষে পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার সরকারি ঘোষণা

রাজ্যবাসীর দীর্ঘ আন্দোলনেরই জয়

এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৪ নভেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

"আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, এ রাজ্যের স্কুলস্তরে পাশ-ফেল প্রথা আসন্ন শিক্ষাবর্ষ থেকেই ফিরে আসছে। আমরা এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাই এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের জনগণের সুদীর্ঘ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বিজয় বলে মনে করি।

সিপিএম সরকার যখন প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়েছিল, তখন থেকেই চার দশক ধরে আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে এরাজ্যে গণআন্দোলন চালানো হচ্ছে, যা

আটের পাতায় দেখুন

এসইউসিআই(সি) এত বড় হয়েছে দেখে আমার গর্ব হচ্ছে

১৭ নভেম্বরের সমাবেশে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বাসদ (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত ভাষণ

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশাল সমাবেশ, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর জেনারেল সেক্রেটারি কমরেড প্রভাস ঘোষ, মঞ্চে উপবিষ্ট পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ সবাইকে লাল সেলাম জানিয়ে আমি খুব অল্প কয়েকটা কথা বলব। এই দুর্যোগের মধ্যে এই বিশাল সমাবেশ নভেম্বর বিপ্লবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছে। আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে যে একটা পার্টি সম্পূর্ণ আদর্শের জোরে এবং তার নিবেদিতপ্রাণ কর্মী-সংগঠক-নেতাদের শক্তির জোরে এই বিশাল সমাবেশ করতে পেরেছে। এইরকম একটা সমাবেশ একমাত্র এই পার্টি ছাড়া আর কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমি এই দেশকে একরকম ভাবে জানি। এইরকম সমাবেশ করতে অন্যদের যে সরকারি ক্ষমতা, সংসদীয় রাজনীতি, পার্লামেন্টের মেম্বার ইত্যাদি বহু শক্তি ও আর্থিক শক্তির সহায়তা লাগত, এই পার্টির তা নেই। এই পার্টি সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জনগণের উপরে নির্ভর করে এতবড় সমাবেশ

আটের পাতায় দেখুন

দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করেছে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র

একের পাতার পর

সমস্ত জেলা থেকে, তাদের সকলকেই অন্যরাও জানিয়েছেন, আমিও সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কমরেডস, হাজার হাজার বছর ধরে, যুগ যুগ ধরে মানব ইতিহাসে— সেই আদিম সমাজের পর থেকে যখন শ্রেণিবিভক্ত দাসসমাজ শুরু হল সেই যুগে, পরে রাজতন্ত্রের যুগে এবং পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের যুগে শোষিত অত্যাচারিত নিষ্পেষিত মানুষ চোখের জলে বারবার প্রশ্ন তুলেছে— এই দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে কি? শোষণ অত্যাচার বন্ধ হবে কি? শোষণমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে কি? মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে মহান লেনিন এবং তাঁর সুযোগ্য সহযোদ্ধা মহান স্ট্যালিন নভেম্বর বিপ্লব সংগঠিত করে উত্তর দিয়ে গেছেন— ইতিহাসে শ্রেণিশোষণ উচ্ছেদ করা সম্ভব, শোষিত মানুষ যদি বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে সংগঠিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, যদি সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে লড়াই করতে পারে তা হলে চিরদিনের জন্য মানবসমাজ থেকে শ্রেণিশোষণ ও শ্রেণিশাসন, অত্যাচার বন্ধ করা সম্ভব। নভেম্বর বিপ্লব এটা বাস্তবে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে।

নভেম্বর বিপ্লব বিংশ শতাব্দীতে মানবসভ্যতায় আলোড়ন তুলেছিল। দেশে দেশে শোষিত মানুষকে অনুপ্রাণিত উৎসাহিত করেছিল। আবার এই নভেম্বর বিপ্লব বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল। বিংশ শতাব্দীর সব থেকে মহৎ ও যুগান্তকারী ঘটনা নভেম্বর বিপ্লব। মহান নভেম্বর বিপ্লব শুধু বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার বুকে শোষণমূলক ব্যবস্থাকেই উচ্ছেদ করেনি, দেশে দেশে শোষিত শ্রমিক শ্রেণিকে শুধু অনুপ্রাণিতই করেনি, মানবসভ্যতার গতিপথ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই নভেম্বর বিপ্লব সৃষ্ট সমাজতন্ত্র নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যেমন আপনারা জানেন, আগে সমস্ত এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠনক্ষেত্র ছিল, উপনিবেশ, আধা উপনিবেশ ছিল। এর বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা আন্দোলন দেশে দেশে গড়ে উঠেছিল তার প্রেরণা জুগিয়েছে নভেম্বর বিপ্লব সৃষ্ট রাশিয়ার সমাজতন্ত্র। এইজন্য চিনে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা ডাঃ সান ইয়াৎ সেন, ইন্দোনেশিয়ার সোয়েকর্ন, আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, এঁরা সকলেই বারবার সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র প্রথমবার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে হরিপুরা অধিবেশনে বলেছিলেন, বিশ্বে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ আর একদিকে সমাজতন্ত্র। এই সমাজতন্ত্র আমাদের প্রেরণাদায়ক। এ দেশের বিপ্লবীরা সকলেই তাই মনে করতেন। বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যত দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছিল, প্রত্যেকটি আন্দোলনকে মদত দিয়েছে, সাহায্য দিয়েছে রাশিয়ার সমাজতন্ত্র। না হলে সাম্রাজ্যবাদীরা সহজে পিছু হটত না। সমাজতন্ত্রের জন্যই বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন জয়যুক্ত হতে পেরেছিল।

ভারতবর্ষেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এ কথা ঠিক। আজাদ হিন্দ বাহিনীর লড়াইয়ের সংবাদ পৌঁছনো, বম্বের নৌবিদ্রোহ, তার আগে '৪২-এর আগস্ট বিদ্রোহ একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তার চেয়েও বড় কথা সমাজতন্ত্রের বিজয়যাত্রা, পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্র, চিনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জয়যাত্রা, ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদীদের আতঙ্কিত করে দেয়। তাড়াতাড়ি তারা বোঝাপড়া করে নেয় ভারতবর্ষের পুঁজিপতি শ্রেণির সাথে যাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো, চে গুয়েভারা— এঁদেরও প্রেরণা দিয়েছে নভেম্বর বিপ্লব। আফ্রিকার প্যাট্রিস লুমুম্বা যাঁকে আমেরিকা হত্যা করেছিল তাঁরও প্রেরণাদাতা নভেম্বর বিপ্লব। আবার এই দেশগুলি স্বাধীন হওয়ার পরে সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছিল যাতে এরা স্বাধীনভাবে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। তখন সমাজতান্ত্রিক শিবির এগিয়ে এসে উদার হস্তে এই দেশগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য করেছিল। ভারতবর্ষ সহ এই সমস্ত দেশগুলিকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করেছিল স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে। একটা সময় ছিল এই নব্যস্বাধীন পুঁজিবাদী দেশগুলো চেয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের কবজা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে। জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল, তাও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহায্য নিয়েই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন ফ্যাসিস্ট জার্মানি, ইটালি, জাপানি সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করছে, পূর্ব ইউরোপ দখল করেছে, ফ্রান্স দখল করেছে, ইংল্যান্ড দখল করার মুখে, জাপানের সৈন্যবাহিনী বর্মা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, চিন দখল করেছে— এইভাবে গোটা বিশ্ব যখন বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ত্রাতার ভূমিকা পালন করেছিল মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন, সোভিয়েত লালফৌজ। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সেই সময়ের বিশ্বের বরেণ্য মনীষী রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, আমাদের দেশের সমস্ত বুদ্ধিজীবী মনীষী সকলেই তাকিয়ে ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। রবীন্দ্রনাথ তখন মৃত্যুশয্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখছেন, প্রতিদিন তিনি খবর নিতেন রাশিয়ার লালফৌজ কতটা এগোচ্ছে। যেদিন শুনতেন এগোচ্ছে না, কাগজ ছুঁড়ে ফেলতেন দুঃখে। যেদিন তাঁর অপারেশন হয় সেদিন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বললেন, লালফৌজ এগোচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন ওরাই পারবে, ওরাই ঠেকাতে পারবে, ওরাই জিতবে। সত্য সেটাই, যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকত, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র না থাকত, মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ লড়াই না হত, তাহলে সেদিন বিশ্বের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যেত। এটা শুধু আমাদের দাবি নয়। সাম্রাজ্যবাদীদের কর্ণধার চার্চিল, রুজভেল্ট এরা পর্যন্ত সোভিয়েতের এই ভূমিকা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে নভেম্বর বিপ্লব মানব ইতিহাসে নির্ণায়কের ভূমিকা নিয়েছিল।

আপনারা শুনেছেন, আমাদের পত্রপত্রিকায় পড়েছেন, এই নভেম্বর বিপ্লবকে একদিকে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, প্রেমচন্দ, সুব্রমণিয়ম ভারতী, মুলক রাজ আনন্দ, কিষণচন্দ, ইকবাল, নজরুল— এইসব সাহিত্যিকরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র শ্রমিক বিপ্লবের আহ্বান নিয়ে 'পথের দাবী' লিখেছেন, যা ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেছিল। নজরুল সাম্যবাদ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্যের জয়গান গেয়ে কবিতা রচনা করেছেন। আবার বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রাই, এঁরাও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র অভিনন্দন জনিয়েছিলেন, নেহেরু নভেম্বর বিপ্লবকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন। গান্ধীজিও প্রশংসা করেছিলেন। যদিও এঁরা কেউই কমিউনিস্ট ছিলেন না। পাশ্চাত্যের রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, এঁরাও সমাজতন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। কী দেখে? তাঁরা দেখেছিলেন ফরাসি বিপ্লব রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র কায়েম করেছিল, সেখানকার ভূমিদাসরা উদীয়মান বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করেছিল তাতে স্লোগান উঠেছিল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-সেকুলার মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করার। দাবি উঠেছিল গণতন্ত্র কায়েমের। আমেরিকা থেকে উঠেছিল ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল-এর ধারণা। এটা একটা নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল বিশ্বে। পরবর্তীকালে এই বুর্জোয়া শ্রেণি তার রাজতন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের স্তরে, যখন তার কৈশোর-যৌবন ছিল, তার যে প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল, তা অতিক্রম করে পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মে ক্ষুদ্র পুঁজি যখন বৃহৎ পুঁজি, একচেটিয়া পুঁজিতে পরিণত হয়, তখন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ঝান্ডা, গণতন্ত্রের ঝান্ডা, মানবতাবাদের ঝান্ডা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফলে বুর্জোয়া বিপ্লবের সাম্য-স্বাধীনতার স্লোগান পরবর্তীকালে বুর্জোয়ারাই পদদলিত করেছে। আজ আমরা পৃথিবীর সর্বত্র দেখছি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কী চরম বৈষম্য! বিবিসি বলছে, এক শতাংশ মানুষ ৯৯ শতাংশ মানুষের সম্পদের মালিক। ৩০০ কোটি মানুষের সমান সম্পত্তির মালিক বিশ্বের মাত্র ৮টি পরিবার। আমাদের দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের সমান সম্পত্তির মালিক মাত্র ৫৭টি পরিবার। একদিকে শ্রমিকদের প্রাপ্য ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয়ের হাতে সঞ্চিত হয়েছে বিশাল ধন সম্পদ, বিশাল ঐশ্বর্য, চলছে তাদের রাজকীয় ভোগবিলাস। অন্য দিকে কোটি কোটি বেকার ও ক্ষুধার্ত মানুষ, ছাঁটাই শ্রমিক অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মরছে। এই চরম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় কি সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব? ফলে পুঁজিবাদ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বৈষম্যের উপরে পুঁজিবাদ দাঁড়িয়ে আছে। পুঁজিবাদ মানবজাতির মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী গড়ে তুলবে কি, বরং তা ধ্বংস করছে। ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, যুদ্ধবিগ্রহ এসবের মধ্য দিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ধ্বংস করছে। আর স্বাধীনতা বলতে পুঁজিবাদ বোঝে লুণ্ঠনের স্বাধীনতা, শোষণের স্বাধীনতা। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা অবাধে শোষণ করবে, লুণ্ঠন করবে— এই স্বাধীনতা। আর জনগণের রয়েছে অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর স্বাধীনতা, আত্মহত্যার স্বাধীনতা। প্রতিবাদ করার কোনও উপায় নেই, প্রতিরোধ করার উপায় নেই, করলেই চরম দমন-পীড়ন।

ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল এখন হচ্ছে ফর দ্য মানি পাওয়ার, বাই দ্য মানি পাওয়ার, অফ দ্য মানি পাওয়ার। এই যে গুজরাটে ভোট হবে, হিমাচলে হয়ে গেল, আবার রাজ্যে রাজ্যে হবে, এইসব ভোটের ফলাফল কারা নির্ধারণ করছে? এটা কি জনগণের রায়? বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যেন জনগণ ভোট দিচ্ছে। আসলে ভোটের রায় নির্ধারণ করে বুর্জোয়া শ্রেণি। তারাই ঠিক করে কে জিতবে? নির্বাচনে কোটি কোটি টাকার খেলা চলে। এই কোটিপতিদের কালো টাকা, সাদা টাকা বুর্জোয়া দলগুলো ভোটে কাজে লাগায়। আর পুঁজিপতি নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম বিশেষ দল বা জোটের পক্ষে হাওয়া তুলে দেয়। পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র সেই ভাবে কাজ করে। অসচেতন, অসংগঠিত মানুষ দিকভ্রান্ত হয়। টাকায় ভোট কেনাবেচা হয়। লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক টাকা নিয়ে ভোটে খাটে। এই তো গণতন্ত্র! এই হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী সব দেশেই এভাবেই 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন' হয়। আমাদের দেশ সহ সব দেশে বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়করা সকলেই ভণ্ড, প্রতারক, মিথ্যাবাদী। এরা মানুষকে ঠকায়, কথা দিয়ে কথা রাখে না। শুধুমাত্র মানুষকে ঠকানোর জন্য যত রকমের ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে পারে তাই করে। ফলে ভোট একটা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। বুর্জোয়ারা নির্বাচনের নামে জনগণকে ঠকাচ্ছে।

পশ্চিম দিগন্তে বুর্জোয়া গণতন্ত্র যখন অস্তমিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন পূর্ব দিগন্তে সর্বহারা গণতন্ত্রের রক্তিম অভ্যুদয় বিশ্বের মনীষীদের মুগ্ধ করেছিল। রাশিয়ার সর্বহারা শ্রেণি কর্তৃক উত্থিত যথার্থ গণতন্ত্র, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ঝান্ডাকে তাঁরা সশ্রদ্ধচিত্তে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রাশিয়ায় না এলে আমার এ জন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত। পৃথিবীর সব থেকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে রাশিয়ায়। পরে ১৯৩৯ সালে আবার কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন, মানবের নবযুগের তপোভূমি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। সেখানে গিয়ে যে আনন্দ এবং আশা পেয়েছি মানব ইতিহাসে কোনও দিন এত আশা আনন্দ পাইনি। আশা করি এদের সাধনা সফল হোক। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানি মানবজাতিকে দিয়েছে মার্কসবাদ। আর বিংশ শতাব্দীর রাশিয়া দিয়েছে সর্বহারা রাষ্ট্র, সর্বহারা গণতন্ত্র, সর্বহারা সংস্কৃতি। তিনি বলেছেন, বিশ্বে দুইটি স্রোত বইছে। একটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের স্রোত, তার বিপরীতে ধাবমান কমিউনিজমের স্রোত। হিটলারের পরাজয়ের অর্থই হচ্ছে কমিউনিজমের বিজয়। কী দেখে তিনি বললেন? নভেম্বর বিপ্লব সৃষ্ট সোভিয়েত সভ্যতার অগ্রগতি দেখেই। (এই সময় প্রবল বৃষ্টির কারণে কমরেড ঘোষ সামনে উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে বক্তৃতা চালাবেন কি না জানতে চান। উপস্থিত সকলেই তাতে সম্মতি জানান)

আমাদের দেশের সংবিধান কে তৈরি করেছে? ইংল্যান্ড, আমেরিকা বিভিন্ন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের সংবিধান কে তৈরি করেছে? পুঁজিবাদী চিন্তার দ্বারা পরিচালিত কিছু আইন বিশেষজ্ঞ। সংবিধান রাষ্ট্রের কাঠামো নির্ধারণ করে, তার ভিত্তিতে জনগণের অধিকার ঘোষিত হয়, আইন-কানুন ঠিক হয়, প্রশাসন চলে। রাশিয়ায়

তিনের পাতায় দেখুন

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ছিল একমাত্র শ্রমিক-কৃষকের

দুয়ের পাতার পর

বিপ্লবের পরে প্রথমে অস্থায়ী সংবিধান রচিত হয়েছিল। তারপরে ১৯৩৬ সালে যে স্থায়ী সংবিধান রচিত হয়, আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, সেই সংবিধানের খসড়া তৈরি করে কোটি কোটি শ্রমিক কৃষকের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। কোটি কোটি শ্রমিক-কৃষক গোটা দেশে হাজার হাজার সভা করে এই সংবিধান পড়ে তাদের মতামত দিয়েছে। সেই মতামতের ভিত্তিতে রাশিয়ার সংবিধান রচিত হয়। এটাই যথার্থ বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল বলতে যা বোঝায় তাই। সোভিয়েত রাশিয়ায় ভোটে প্রার্থী হত শ্রমিক-কৃষক। আমাদের দেশে কারা ভোটে দাঁড়ায়? গরিব মানুষ ভোটে দাঁড়ানোর কথা কখনও ভাবতে পারে না। যদিও তারাই সংখ্যায় বিপুল গরিষ্ঠ । ভোটে দাঁড়ায় বুর্জোয়া দলের লোকেরা বা তাদের টাকায় তাদের পছন্দের প্রার্থীরা। আর গরিবদের মধ্যে তারা কিছু দালাল সৃষ্টি করে দাঁড় করায়, এই পর্যন্ত। সোভিয়েত সংবিধানে একমাত্র নির্বাচিত হওয়ার অধিকার ছিল শ্রমিক-কৃষকের। তারাই ভোট দেবে এবং তাদের দ্বারাই নির্বাচিত হবে। এটা পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। এই হচ্ছে বাই দ্য প্রোলেটারিয়েট পিপল, অফ দ্য প্রোলেটারিয়েট পিপল, ফর দ্য প্রোলেটারিয়েট পিপল।

১৬টি ন্যাশনালিটি স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল। রাশিয়ার সংবিধানে ছিল প্রত্যেকটি জাতির সমান অধিকার। এটাও সংবিধানে ছিল যে, কোনও ন্যাশনালিটি চাইলে আলাদা রাষ্ট্র হয়ে যেতে পারে। প্রত্যেকটি ন্যাশনালিটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানকে মেনে তাদের নিজ নিজ এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংবিধান রচনা করতে পারত। এই অধিকার বহু ন্যাশনালিটি অধ্যুষিত কোনও পুঁজিবাদী দেশে নেই। এই অধিকার একমাত্র সোভিয়েত গণতন্ত্র দিয়েছিল। সোভিয়েতে যাকে মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচন করত, তাকে নিজের কাজ সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে হত, এটা বাধ্যতামূলক ছিল। এই সিস্টেম কোনও পুঁজিবাদী দেশে নেই। আমাদের দেশে ভোটে জেতার পর পাঁচ বছর নির্বাচিত প্রার্থীর দেখাই পাওয়া যায় না। সোভিয়েতে ভোটদাতারা যদি মনে করত ওর দ্বারা কাজ হচ্ছে না, তাকে পাল্টাতে পারত। এই অধিকারও কোথাও নেই। ফলে যথার্থ শোষিত জনগণের গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তা সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

আজ পৃথিবীতে কোটি কোটি বেকার। আমাদের দেশের হাল আপনারা জানেন। মানুষ পাগলের মতো ঘুরছে কোথাও যদি কোনও কাজ পাওয়া যায়। সামান্য অংশ যারা কাজ পাচ্ছে, তা পাচ্ছে কন্ট্রাকটরের অধীনে, স্থায়ী চাকরি জুটছে না, স্থায়ী মজুরি দেওয়া প্রায় বন্ধ। মালিক যে মজুরি দেবে তাতেই কাজ করতে শ্রমিক বাধ্য। যখন তখন ছাঁটাই করতে পারে। গ্রামের লোক পাগলের মতো শহরে ছুটছে। এ শুধু আমাদের দেশেই নয়, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এমনকী খোদ আমেরিকায়, যেটা বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ, সেখানেও এই একই অবস্থা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলছেন, আমার দেশে চাকরি নেই। মার্কিন পুঁজিপতিদের বলছেন, তোমরা সস্তায় বিদেশি মজুর আনছ, তার ফলে আমাদের দেশের ছেলেরা বেকার হচ্ছে। এটা চলবে না। মার্কিন পুঁজিবাদের এগ্রিগেট বা সামগ্রিক স্বার্থে রাষ্ট্র মাল্টিন্যাশনালদের ডিকটেট করছে যে আউটসোর্সিং বা অন্যদের দিয়ে কাজ করানো চলবে না। আমেরিকান শ্রমিক নিয়েই কাজ করতে হবে। এইরকম তীব্র বেকার সংকট সেখানেও। যে আমেরিকা ছিল গ্লোবালাইজেশনের হোতা আজ তার ত্রাহি ত্রাহি রব। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলছে গ্লোবালাইজেশনে আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে। এখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিবাদী চীন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলছেন, আমাদের দেশে ইকোনমিক অ্যাগ্রেশন হচ্ছে, অর্থনৈতিক আক্রমণ হচ্ছে। বলছেন, আমাদের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হচ্ছে। কে বলছে? যে দেশ এতদিন ধরে কত দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করেছে! আমেরিকার ভোগ্যপণ্যের বাজার এখন চীনের পণ্যে ভর্তি। ফলে মার্কিন শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মার্কিন শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। এখন আমেরিকার কাছে নিজের স্বার্থই প্রথম। সে এখন গ্লোবালাইজেশনের চুক্তি কিছু মানবে না। আবার চীনের প্রেসিডেন্ট এখন গ্লোবালাইজেশনের পক্ষে সওয়াল করছে অন্য দেশের বাজার দখলের স্বার্থে। এইরকম অবস্থা এখন সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ায়।

রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছিল ১৯১৭ সালে। ১০ বছর লেগেছিল প্রথম মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করতে। ১৯৩০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করল, দেশে কোনও বেকার থাকবে না। সকলেই কাজ পাবে। সেখানে সংবিধান অনুযায়ী ব্যক্তি মাত্রেই কাজ পাওয়ার অধিকারী। তারা বলল, কাজ না করলে খাবার জুটবে না। মানে কাজ না করে কেউ থাকতে পারবে না। ৭০ বছর সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকার সমস্যা বলে কিছু ছিল না, অর্থনৈতিক মন্দা বলে কিছু ছিল না, মুদ্রাস্ফীতি বলে কিছু ছিল না, বাজারের ওঠানামা বলে কিছু ছিল না। আপনারা অনেকেই জানেন, বিপ্লবের পরেই লেনিন লিগ অফ নেশনস-এ ঘোষণা করেছিলেন, সব রাষ্ট্র সব অস্ত্র ধ্বংস করুক। অস্ত্রের দরকার নেই। যুদ্ধ চিরদিনের জন্য বন্ধ হোক। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরা রাজি হয়নি। একই ঘোষণা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মহান স্ট্যালিন করেছিলেন— পারমাণবিক অস্ত্র সহ সমস্ত অস্ত্র নিষিদ্ধ হোক। যুদ্ধে সমাজের ক্ষতি, লক্ষ কোটি মানুষ মারা যায়। কত দেশ ধ্বংস হয়। এই ঘোষণা অন্য কোনও দেশ করতে পেরেছে? একমাত্র সোভিয়েত সমাজতন্ত্র করতে পেরেছে, কারণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনীতির যুদ্ধ বা পরদেশ দখল প্রয়োজন ছিল না। বরং সব সময়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য কাজ করেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা রাজি হয়নি। রাজি হওয়ার উপায় নেই। যুদ্ধ পুঁজিবাদের প্রয়োজন। দেশের মানুষের যখন কেনার ক্ষমতা নেই, শোষিত মানুষ যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে পারে না, তখন একচেটিয়া পুঁজির বিদেশের বাজার চাই। বিদেশি বাজার দখল করা, লুণ্ঠন করা, শোষণ করার পথে বাধা এলে যুদ্ধ চাই। প্রথম মহাযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীরা বাধিয়েছিল বাজারের জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও সাম্রাজ্যবাদীরা বাধিয়েছিল বাজারের জন্য। আজও তাদের যুদ্ধ প্রয়োজন।

এখানে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। এখন প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই একদিকে কোটি কোটি মানুষ বেকারির জ্বালায়, ছাঁটাইয়ের জ্বালায় ছটফট করছে, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, অথচ সামরিক বাজেট বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে সামরিক চুক্তি করেছে। এর আগেও সামরিক চুক্তি করেছিল। আমেরিকার হোয়াইট হাউস থেকে ঘোষণা হয়েছে, টু লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি উইল বিকাম বিগেস্ট মিলিটারি পাওয়ার। অর্থাৎ আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ ওদের ভাষায় বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং ওরা হাত মিলিয়ে বৃহত্তম সামরিক শক্তিতে পরিণত হবে। ভারত একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়েছে, লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়েছে। ভারত এখন সাম্রাজ্যবাদী। ভারত এখন বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা নানা জায়গায় আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এমনকী ইংল্যান্ডে, আমেরিকাতেও কলকারখানা করছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে বেরিয়েছে ভারতীয় মালিকরা আমেরিকায় যে কলকারখানা করছে তাতে ১ লক্ষ ১২ হাজার মার্কিন শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করে। ভারতীয় জাতীয় পুঁজি ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করছে। এটাই হচ্ছে ভারতীয় পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র। ভারত এখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সিপিএম, সিপিআই এখনও ভারতের জাতীয় পুঁজিকে প্রগতিশীল চিহ্নিত করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব আউড়ে যাচ্ছে। অথচ রাশিয়ায় কৃষিতে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, পুঁজিবাদ অনুন্নত হওয়া সত্ত্বেও ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর যেহেতু রুশ বুর্জোয়া শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে সেই জন্য লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করেছেন। সিপিএম সিপিআইয়ের এই অমার্কসবাদী ও বিপ্লববিরোধী তত্ত্বের জন্যই এরা কখনও স্বৈরাচার বিরোধিতার নামে জনসংঘ ও পরে বিজেপির সাথে ঐক্য করেছে, কখনও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার নামে কংগ্রেসের হাত ধরছে। মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে ভারতকে যুক্ত করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জাপান, ভারত, অস্ট্রেলিয়াকে যুক্ত করে চীন রাশিয়ার পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আরেকটা অর্থনৈতিক সামরিক জোট গঠন করছে। এটা বিপজ্জনক। লেনিন দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদ থেকেই সাম্রাজ্যবাদের জন্ম। আর সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের জন্ম দেয়। যুদ্ধ অর্থনীতির আরও প্রয়োজন যেহেতু ভোগ্যপণ্যের বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই। ফলে বিকল্প সামরিক অস্ত্রের বাজার চাই। আমেরিকা ভারতকে অস্ত্র বিক্রি করছে, জাপানকে অস্ত্র বিক্রি করছে, আরও বিভিন্ন দেশকে অস্ত্র বিক্রি করছে। এর অর্থ হল, মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে আমেরিকা তার অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। একেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্ট্যালিন বলেছিলেন, মিলিটারাইজেশন অফ ইকোনমি। আমাদের দেশের পুঁজিপতিরাও তাই করছে, অর্থাৎ মিলিটারাইজেশন অফ ইকোনমি অ্যাট দ্য কস্ট অফ দ্য পিপল। জনস্বার্থকে বিপন্ন করে অর্থনীতির সামরিকীকরণ করছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই সংকট অনিবার্য। এর পাল্টা হচ্ছে সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম হল, মুনাফা, আরও মুনাফা, চূড়ান্ত মুনাফা অর্জন। সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য প্রয়োজন সর্বোচ্চ শ্রমিক শোষণ। আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ম জনগণের বৈষয়িক চাহিদা যত বাড়ছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাহিদা যত বাড়ছে তত সেই চাহিদা পূরণ করার জন্য উৎপাদন। শ্রমিক শোষণ করে মুনাফার প্রশ্ন নেই। শ্রমিক-কর্মচারীর নিয়োগও ঘটেছে বর্ধিত হারে। ফলে কোনও বাজার সংকট ছিল না, মন্দা ছিল না। কোনও ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন ছিল না। বেকারত্বের প্রশ্ন ছিল না। ক্রমাগত সে এগিয়েছে, শক্তিশালী হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে দু'রকমের মজুরি ছিল। একটা হচ্ছে আর্থিক মজুরি, আর একটা সামাজিক মজুরি। কারখানায় শ্রমিকরা কী মজুরি পাবে সেটা ফ্যাক্টরি কমিটি আর শ্রমিকের প্রতিনিধিরা মিলে ঠিক করত। একটা অংশ তারা অর্থ হিসাবে নিত। আরেকটা অংশ রাষ্ট্রকে দিত। রাষ্ট্র নিত কী জন্য? কোনও ব্যক্তির মুনাফার জন্য নয়। উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্প ও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন, প্রশাসনিক কাজকর্ম চালানো, সাম্রাজ্যবাদী হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি প্রয়োজনে শ্রমিক শ্রেণিই স্বেচ্ছায় তার উৎপাদিত সম্পদের একটা অংশ রাষ্ট্রকে দিত। সর্বোপরি ছিল সামাজিক কল্যাণ। সেটা হচ্ছে রাশিয়ায় শ্রমিকরা অল্প ভাড়ায় বাড়ি পেত, স্বল্পমূল্যে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য পেত। শ্রমিকরা বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি, জল, পরিবহণ, কাজের পোশাক পেত। সব থেকে বড় কথা, রাশিয়া সার্বজনীন শিক্ষার প্রচলন করেছিল। ৮০টি মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত। আগে ৩০টি ভাষার বর্ণমালা ছিল না। ভাষাতত্ত্ববিদরা ৩০টি ভাষার বর্ণমালা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। প্রাইমারি থেকে ইউনিভার্সিটি স্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা স্টাইপেন্ড পেত রাষ্ট্র থেকে। এইসব সুযোগের কথা আপনারা কি ভাবতে পারেন? সকল পুঁজিবাদী দেশে, আমাদের দেশে শিক্ষা তো বাজারের পণ্য। যার টাকা আছে, সেই পড়তে পারে। রাশিয়াতে বিনা ব্যয়ে সকলের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল। সমস্ত হাসপাতালের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। ক্রমাগত ডাক্তার-নার্সের সংখ্যা বাড়াচ্ছিল। নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার করছিল। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এই ব্যবস্থা কে কবে করতে পেরেছে? সর্বত্রই তো চিকিৎসা পরিষেবা বাজারের পণ্য, বিনা চিকিৎসায় কত কোটি লোক মারা যাচ্ছে। অথচ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা কার্যকরী ছিল। আমাদের দেশে রাস্তায় ভিখারি পাবেন। অন্ধকার নামলে অসংখ্য নারীদেহ বিক্রির বাজারে দাঁড়ায়। এই চিত্র ভারতবর্ষের, বাংলাদেশের, নেপালের, পাকিস্তানের, আমেরিকার, ইউরোপের সব দেশের। রাশিয়া নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ করেছিল। যারা এর মধ্যে যুক্ত ছিল তাদের পুনর্বাসন দিয়েছিল। পতিতা শব্দ আমি ব্যবহার করতে চাই না, ইংরেজিতে বলে প্রস্টিটিউট। জারের আমলে এমন প্রস্টিটিউট যারা ছিল তাদের প্রত্যেককে ট্রেনিং দিয়ে সুশিক্ষিত করে যাতে তারা মর্যাদা সহকারে

চারের পাতায় দেখুন

বুর্জোয়া বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান বাস্তব করেছিল সমাজতন্ত্র

তিনের পাতার পর

সুস্থ নাগরিক জীবন যাপন করতে পারে তার বন্দোবস্ত করেছিল। প্রত্যেক দেশের ফুটপাতে অসংখ্য শিশু, ভিখারি পাওয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এটা বন্ধ করে দিয়েছিল। এই শিশুদের, ভিখারিদের পুনর্বাসিত করেছিল। রাশিয়া নারীমুক্তির পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করেছিল। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে এবং আমাদের দেশে মেয়েরা এখনও মূলত অন্তঃপুরে বন্দি। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আসতে পারে না। শিক্ষার সুযোগ পায় না। পুরুষশাসিত সমাজে বন্দি। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র তাদের মুক্তির দরজা খুলে দিয়েছিল। নারী পুরুষের সমানাধিকার দিয়েছিল, সমকাজে সমবেতন দিয়েছিল এবং নারীকে যাতে রান্নায় ব্যস্ত থাকতে না হয় তার জন্য ১০/১৫টি পরিবার নিয়ে কো-অপারেটিভ কিচেন, কো-অপারেটিভ ডাইনিং হল, কো-অপারেটিভ লন্ড্রি — এ সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল যাতে কোনও পরিবারে কেউ আটকে না থাকে। সন্তানসম্ভবা মায়েদের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি সন্তান জন্মের ১২ সপ্তাহ আগে থেকে জন্মের ১২ সপ্তাহ পর পর্যন্ত। তারপরে ১ বছর সবেতন ছুটি। তারপরে কাজে গেলে ক্রেশে সন্তানকে রেখে দিত। সেই সন্তানকে খাওয়ানোর, পোশাক দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। অসংখ্য কিন্ডারগার্টেন নার্সারির ব্যবস্থা ছিল এই শিশুদের লালনপালন করার জন্য। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে শ্রমিক-কৃষকরা বছরে ১৫ দিন সবেতন ছুটি পেত। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সমুদ্র উপকূলে, পাহাড়ের ধারে স্যানেটোরিয়ামে যেত। এই ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিকে শ্রমিকদের ৬ দিন দৈনিক ৮ ঘণ্টা পরে ৭ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারিত হয়, পরে ৬ ঘণ্টা ও ৫ ঘণ্টা করার প্রস্তাব করেছিলেন স্ট্যালিন। বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, যাদের দেখার কেউ ছিল না, তাদের দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করত। রাশিয়ার সমাজতন্ত্রে আদালতে বিচারপ্রার্থীকে কোনও ব্যয় করতে হত না, উকিল নিয়োগ সহ সব ব্যয়ের দায়িত্ব রাষ্ট্রই বহন করত। সেখানে শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের আলাদা রোজগার করতে হত না, রাষ্ট্রই তাঁদের সকল দায়িত্ব বহন করত। শহরে-গ্রামে হাজার হাজার লাইব্রেরি, থিয়েটার মঞ্চ, সিনেমা হল ছিল বিনাব্যয়ে বিশ্বসাহিত্য পড়াশোনা, সাংস্কৃতিক বিনোদনের জন্য। রাষ্ট্রের ব্যয়ে স্বাস্থ্যচর্চা, ক্রীড়া ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। যার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন অলিম্পিকে শীর্ষস্থান দখল করেছিল। বিজ্ঞানে এত অগ্রগতি ঘটিয়েছিল যে, পুঁজিবাদীদের নিয়ন্ত্রিত নোবেল কমিটি ১২ জন সোভিয়েত বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দিতে বাধ্য হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নই বিশ্বে প্রথম মহাকাশে মানুষ পাঠিয়েছিল। আমি কিছু দিক মাত্র উল্লেখ করলাম। এটা শুনে মনে হবে স্বপ্নলোকের স্বর্গরাজ্য। আর এটাই বাস্তবে সম্ভব করেছিল মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে মহান লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। এ কাজ সম্ভব হল কী করে?

বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র লেনিনের কল্পনাপ্রসূত ছিল না। তিনি মার্কসের শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন। এটা মার্কসেরও কল্পনাপ্রসূত নয়। মার্কস বিজ্ঞানকে সত্যানুসন্ধানে ব্যবহার করেছিলেন। মার্কসের আগে বিভিন্ন যুগে যাঁরা দার্শনিক ছিলেন, চিন্তানায়ক ছিলেন, তাঁদের সময়ে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি ঘটেনি। তখন একজন দার্শনিকের মনের উপলব্ধিকেই সত্য বলে গণ্য করা হত। সত্য নির্ধারণ করতে একজন ব্যক্তির মনে হওয়া, একজন চিন্তানায়কের মনে হওয়া, একটা গ্রন্থে লিখিত বক্তব্য— এটাই কি ঠিক? তাহলে বিদ্যুৎ কী, বিদ্যুৎ কী করে উৎপাদন করা যায়, জল কী, হাইড্রোজেন কী, অক্সিজেন কী, ইলেকট্রন কী, মেঘ-বৃষ্টি হয় কেন, জোয়ার-ভাটা হয় কেন— এসব প্রশ্নে সকলে সর্বসম্মতভাবে সত্য নির্ধারণ করে একমত হবে কী করে? একই প্রশ্নে বিভিন্ন চিন্তানায়ক ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রন্থেও বিভিন্ন উত্তর আছে। এটা সম্ভব একমাত্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রমাণিত সত্যের ভিত্তিতে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা, নিরন্তর পরিবর্তনশীল প্রকৃতিজগতের, বস্তুজগতের বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছে, সেই নিয়মগুলিকে মালার মতো গেঁথে নিয়ে, কো-রিলেট করে, কো-অর্ডিনেট করে তার থেকে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছেন মহান মার্কস। যেটা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আবিষ্কৃত সাধারণ নিয়ম। তিনি দেখিয়েছেন, গোটা বিশ্বপ্রকৃতি, প্রাণীজগৎ, মানবজীবন— সবকিছু নিয়ত পরিবর্তনশীল, গতিশীল। আবার এই গতি, পরিবর্তন কিছু সাধারণ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতি ও বস্তুজগতের পরিবর্তনের সেই নিয়মকে বিজ্ঞানের দ্বারা যেমন জানা যায়, মানবসমাজের পরিবর্তনের নিয়মকেও তেমনই জানা যায়।

এখানে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই। অত্যাচার থেকে মুক্তির চিন্তা দাসপ্রথার যুগে দাসদের প্রয়োজনে এসেছিল। অত্যাচারিত দাসরা মুক্তি কামনা করেছিল। এই অত্যাচারিত দাসদের চোখের জলই ঈশ্বরচিন্তার জন্ম দিয়েছিল। এ কথা বলেছেন মহান মার্কস, মহান এঙ্গেলস, মহান শিবদাস ঘোষ। অনেকে বলে আমরা মার্কসবাদীরা ধর্মকে অশ্রদ্ধা করি। এটা ঠিক নয়। মার্কসবাদই ধর্মকে ইতিহাসে যথার্থ শ্রদ্ধার স্থান দিয়েছে। বরং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা, বেকন, হবস, ফুয়েরবাক, কান্ট প্রমুখ তখন বলেছিলেন, ধর্ম হচ্ছে ইতিহাসের বিকৃতি— অ্যাবারেশন অফ হিস্ট্রি। মানবসমাজের উদ্ভবের প্রথম দিকে ধর্মীয় চিন্তা ছিল না, এটা সত্য। যেমন এখনও আন্দামানে যান— জারোয়া আছে, আন্দামানি আছে। এদের মধ্যে সম্পত্তি নেই, মালিকানা নেই, ধনী-গরিব নেই। এদের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তাও নেই। ধর্মীয় চিন্তা এসেছে দাস যুগে। সেজন্য মার্কস বলেছেন, ধর্ম হচ্ছে অত্যাচারিত দাসদের দীর্ঘনিঃশ্বাস। বলেছেন, ধর্ম বিবেকহীন পৃথিবীর বিবেক, হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়। এঙ্গেলস খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন, সব ধর্ম সম্পর্কেই প্রযোজ্য সেই কথা। বলছেন, ধর্ম চেয়েছিল এই দুঃখ-দুর্দশা, এই বন্দিজীবন থেকে স্যালভেশন, মানে মুক্তি। স্বর্গে সেই মুক্তি পাওয়া যাবে। আর আমরা বলি, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দ্বারা সেই স্বর্গ এই মাটির পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, কীভাবে সমাজে ধর্মীয় চিন্তা প্রথম এল। দেখালেন, দাসপ্রভু ও দাস— এই দুই ভাগে দাসসমাজ তখন বিভক্ত। দাসপ্রভু চালায় তাই সমাজ নিয়ম-শৃঙ্খলায় চলছে। তা হলে এই বিশ্বও তো চলছে একটা নিয়মে। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, ঋতু পরিবর্তন, জন্ম-মৃত্যু— সব একটা নিয়মে চলছে। তা হলে বিশ্বেরও একটা নিয়ম আছে। ফলে বিশ্বেরও প্রভু আছে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, দাসপ্রভু-দাস নির্বিশেষে তারই সন্তান। এই চিন্তা সেই যুগে স্বাভাবিক ভাবেই এসেছিল ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে। তাঁরা তাঁদের চিন্তায় সমাধান হিসাবে যে উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন, সেটাকে সৎ মনেই ভেবেছিলেন ও প্রচার করেছিলেন— এসবই ধর্মীয় বাণী। সেই ধর্মীয় বাণী প্রচার করতে গিয়েই প্রথম দিকে ধর্মপ্রচারকরা দাসপ্রভুদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছেন, নিগৃহীত হয়েছেন। অনেককে হত্যাও করা হয়েছে। অনেকে অনাহারে মারা গেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, সেই যুগে ধর্ম দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমাজে ন্যায়নীতিবোধ, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ প্রতিষ্ঠায়, ন্যায়-অন্যায় প্রতিষ্ঠায় প্রগতিশীল ও মানব কল্যাণমূলক ভূমিকাই পালন করেছিল। এই হচ্ছে ইতিহাস। আবার এটাও ঠিক, পরবর্তীকালে ধর্মের এই ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। যেমন আজকের দিনে মানবজীবনের কোনও সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধানের পথ কোনও ধর্মীয় গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। বরং যে পুঁজিপতিরা প্রথম যুগে বুর্জোয়া শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মের বিরুদ্ধে লড়েছিল, আজ তারাই অত্যাচারিত মানুষকে বিপথে চালিত করার জন্য ধর্মের অপব্যবহার করছে, গরিব মানুষকে বোঝাচ্ছে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী তাদের পূর্বজন্মের কর্মফল, এটা তাদের পাপের ফল, পুঁজিবাদী শোষণ এর জন্য দায়ী নয়। পূর্বজন্মে পুঁজিপতি-বড় ব্যবসায়ীরা এত পুণ্য করেছে যে বিধাতা তাদের গরিবের রক্ত শুষে নির্বিচারে শোষণ-অত্যাচারের অধিকার দিয়েছে, ফলে এ যেন বিধির বিধান, এর কোনও পরিবর্তন নেই। এ জন্যই পুঁজিবাদের আজ ধর্মের প্রয়োজন। আর প্রয়োজন ধর্মান্ধতা জাগিয়ে যুক্তিবাদী-বিজ্ঞানধর্মী মন ধ্বংস করা এবং ভোটে কাজে লাগানো। ধুরন্ধর এই শোষক ও শাসক শ্রেণির এই 'ধর্মবিশ্বাস' শয়তানি। আর এক দল ধর্ম নিয়ে বিরাট ব্যবসা করছে, বহু অর্থ ও সম্পদের মালিক হচ্ছে। যদিও বহু সাধারণ সৎ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ঠিকমতো বোঝালে নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেয়। আজ ধর্মের এই পরিণতি ঘটলেও মার্কসবাদ দেখিয়েছে, ধর্ম প্রথম যুগে দাসদের মুক্তির বাণী, সমাজ-কল্যাণের আহ্বান নিয়েই এসেছিল। কিন্তু আপনারা জানেন, এই ধর্মকে ভিত্তি করেই রাজতন্ত্র যখন এল, তখন ধর্মকে হাতিয়ার করেই রাজতন্ত্র নতুন অত্যাচার সৃষ্টি করল। এই রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আবার মুক্তি কামনায়, সাম্যের কামনায় ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধেই তৎকালীন গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানধর্মী মননের ভিত্তিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। সেদিন বুর্জোয়ারা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান তুলেছিল, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত সেটা পূরণ করতে পারেনি। যেটা আমি আগে আলোচনা করে গেছি। মার্কসই দেখালেন, কেন এটা পারেনি। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে পুঁজিবাদ শ্রমিককে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে সারপ্লাস ভ্যালু উৎপাদন করে, শোষণ করে, যা এর আগে কোনও অর্থনীতিবিদ দেখাতে পারেননি। ফলে ধারাবাহিকতা বিচার করলে সেই দাসপ্রথার যুগে দাসদের চোখের জলে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সেদিন পূরণ হয়নি, রাজতন্ত্রের যুগেও পূরণ হয়নি, পুঁজিবাদের যুগে পূরণ হয়নি, সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই মার্কসের মাধ্যমে মূর্ত হল। মার্কস বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে দেখালেন, এই মুক্তি সম্ভব। তিনি দেখালেন, বস্তুজগতের মতো, প্রকৃতিজগতের মতো মানবসমাজও পরিবর্তনশীল। আদিম সমাজ, দাসপ্রথা, তারপর রাজতন্ত্র, তারপর পুঁজিবাদ, এই যে পরপর আসছে, এটা হঠাৎ হঠাৎ ঘটনা নয়, কারও খেয়ালিপনা নয়। এটা নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। তিনি দেখালেন, সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার পর শ্রেণিসংগ্রামই হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের প্রধান চালিকা শক্তি। শ্রেণিসংগ্রাম চালিয়ে দাসরা দাসপ্রথাকে উচ্ছেদ করেছে, ভূমিদাসরা উদীয়মান বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে উচ্ছেদ করেছে সামন্ততন্ত্রকে বা রাজতন্ত্রকে। একই ভাবে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করবে শ্রমিক শ্রেণি, প্রতিষ্ঠা করবে সমাজতন্ত্র। তারপর আসবে সাম্যবাদ। এরপরও আসবে পরপর নতুন সমাজব্যবস্থা। এটা ইতিহাস নির্ধারিত বৈজ্ঞানিক নিয়ম। এখানেই মহান মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা।

এই মার্কসবাদকেই প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মহান লেনিন কার্যকর করলেন রাশিয়ার মাটিতে। মনে রাখবেন, একটা দেশে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হলে, কীভাবে গড়ে তুলতে হয়, এই প্রশ্নটা মার্কসের সময় সেইভাবে আসেনি। মার্কসের সময়টা বিপ্লব করার সময় ছিল না। বিপ্লবের পথ তিনি নির্ধারণ করেছেন। পরবর্তী যুগ হচ্ছে, যেটা লেনিনই নির্ধারণ করেছেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগ, সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। একটা দেশে মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তুলতে হলে কী পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে হয়, যেটাকে আমরা বলি লেনিনীয় পদ্ধতি, এটা লেনিন নির্ধারণ করলেন। লেনিন বললেন, একটা কনফারেন্স করে, একটা মিটিং করে, একটা ডিক্রি জারি করে যথার্থ মার্কসবাদী পার্টি গঠন করা যায় না। তার জন্য একটা আদর্শগত সংগ্রাম চাই। ইউনিটি অফ আইডিয়াজ, অর্থাৎ মার্কসবাদী চিন্তার ঐক্য চাই। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য চাই। পুরনো পার্টি আরএসডিএলপি মার্কসবাদী বলে পরিচিত ছিল, কিন্তু যথার্থ ছিল না। তার ভিতরে লেনিন লড়াই করলেন। তার থেকে বেরিয়ে এলেন। ন'বছর লড়াই করলেন মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য গড়ে তোলার জন্য। এই কাজটা এ দেশে সিপিআই করেনি। তাঁরা দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য গড়ে তোলার সংগ্রাম না করে তাড়াতাড়ি বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে একটা পার্টি খাড়া করলেন। যদিও তাঁরা সৎ ছিলেন, কিন্তু লেনিনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করলেন না। লেনিন থেকে শিক্ষা নিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ, দল গঠনের ক্ষেত্রে এই শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে আরও উন্নত করেছেন। লেনিন বলেছেন, মার্কস এঙ্গেলস মার্কসবাদী বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। যারা বাস্তবে এই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করবে তাদের পরিবর্তনশীল জীবনের সাথে মার্কসবাদকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে আরও বিকশিত করতে হবে, আরও উন্নত করতে হবে। এটা লেনিন নিজে করেছেন। স্ট্যালিনও করেছেন। মাও সে-তুঙ-ও করেছেন। ভারতে তথাকথিত কোনও কমিউনিস্ট নেতা এ কাজ করেননি। এ দেশে এই দায়িত্ব কমরেড শিবদাস ঘোষ পালন করেছেন। তিনি মার্কসবাদকে বিকশিত করেছেন, উন্নত করেছেন। লেনিন বলেছেন, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের লাইন— বিশেষ দেশে বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ হবে। তিনি বলেছেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী ফ্রান্সে একভাবে, জার্মানিতে একভাবে, রাশিয়াতে আর একভাবে প্রয়োগ হবে। জেনারেল লাইনকে বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী

পাঁচের পাতায় দেখুন

ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়ারাই ক্রুশ্চেভের মাধ্যমে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের উপর মারাত্মক আক্রমণ হেনেছে

চারের পাতার পর

সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এই যে সাধারণ লাইনের থেকে বিশেষ প্রয়োগ, তার পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য, এসবই কমরেড শিবদাস ঘোষ করেছেন। সেটা অবিভক্ত সিপিআই বা পরে সিপিএম করেনি। লেনিন বলেছেন, বিপ্লবের তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হয় না। কমরেড ঘোষ দেখালেন, এই বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে লেনিন বুঝিয়েছেন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে এই বিপ্লবী তত্ত্ব গড়ে তুলতে হবে। লেনিনের এই শিক্ষাকে কমরেড ঘোষই কার্যকর করেছিলেন। সেটা সিপিআই সিপিএম করেনি। ফলে তারা যৌথ নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ গড়ে তুলতে পারেনি। যার ফলে যথার্থ মার্কসবাদী দল হিসাবে তারা গড়ে ওঠেনি। সিপিএম, সিপিআই সর্বহারা শ্রেণির দল না হয়ে ইউরোপের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলির মতো মার্কসবাদের তকমা লাগিয়ে পেটি বুর্জোয়া দল হিসাবে থেকে গেছে। তা ছাড়া কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও কিছু অবদান রেখেছেন, যা এই সভার আলোচ্য বিষয় নয়।

লেনিন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) গড়ে তুললেন একটা বিপ্লবী দল হিসাবে। তিনি মার্কসবাদকে বিকশিত করে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে এলেন। কমরেড স্ট্যালিন যার নাম দিয়েছেন লেনিনবাদ এবং এ যুগের মার্কসবাদ। আর রাশিয়ার বুকে হবে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে, শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের ভিত্তিতে বিপ্লব, এভাবে বিপ্লবের লাইন নির্ধারণ করলেন। এ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছিল। ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিনরা আপত্তি করেছিল— এক দেশে সমাজতন্ত্র হয় না। কৃষকদের সাথে মৈত্রী হয় না, অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশে বিপ্লব হয় না— এই সব প্রশ্ন তুলেছিল। এ সব প্রশ্নের উত্তর লেনিনকে দিতে হয়েছে। তখন রাশিয়ার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গিন। দুর্ভিক্ষপীড়িত, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ রাশিয়া। অন্য দিকে আঠারোটা সাম্রাজ্যবাদী দেশ ঘোষণা ছাড়াই চারদিক ঘিরে রাশিয়া আক্রমণ করল। এরা গণতন্ত্রের কথা বলে। অথচ এভাবে আক্রমণ করল, সমাজতন্ত্রকে টিকতে দেবে না। কারণ এর প্রভাব তাদের দেশেও পড়বে, সেখানকার শ্রমিকরাও বিপ্লব করবে। তাই শিশু সোভিয়েতকে ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ করল। রাশিয়ার তখন কী দুর্দিন! ঘরে দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক সংকট তীব্র, আর বাইরে থেকে এল আক্রমণ। ভিতরে তখনও শত্রুশ্রেণি গৃহযুদ্ধ চালাচ্ছে। এই অবস্থায় লেনিনকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা হয়। গুলিবিদ্ধ হন তিনি। ১৯২৪ সালে মারা যান। তখন রাশিয়ার অবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। সেই সময় পার্টি নেতা হিসাবে নির্বাচিত করে লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র কমরেড স্ট্যালিনকে। কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ১৯২৭ সালে সোভিয়েতের দ্রুত উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে কথা আপনারা শোনেন, এরও পথপ্রদর্শক রাশিয়া। পাঁচ বছর লাগেনি, তিন বছরেই রাশিয়া বেকারি মুক্ত হল, সকলের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সফল করার পর রাশিয়া বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হল। এই কাজটি হয়েছে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে। এটা খুব সহজ ছিল না। বাইরের কোনও সাহায্য নেই, অর্থনৈতিক অবরোধ, ভিতরে ট্রটস্কি জিনোভিয়েভ কামেনেভ বুখারিন, এরা দলের মধ্যে থেকেও দলবিরোধী কাজ করছে, লেনিনের শিক্ষাকে বিকৃত করছে, কর্মীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তাদের উত্তর দিতে হচ্ছে কমরেড স্ট্যালিনকে। এই একটা আদর্শগত লড়াই। আর একটা লড়াই বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে। আরও একটা লড়াই হচ্ছে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সমাজতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য স্ট্যালিনের আহ্বানে সমগ্র দেশের শ্রমিক-কৃষক বলতে গেলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করেছে। তারপর ১৯৩৪ সালের দিকে রাশিয়া বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হল।

পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ১০০ জন কমসোমল সদস্যের কুচকাওয়াজ

সমাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার জন্য এরপর হল আর একটা ষড়যন্ত্র। বাইরের আক্রমণ ছিল, ভিতরে ষড়যন্ত্র চলছিল। এটা মারাত্মক আক্রমণ। পার্টির প্রথম সারির নেতা কিরভকে পার্টির হেডকোর্য়াটার লেনিনগ্রাডে গুলি করে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীকে ধরার পর জেরা করে জানা যায়— সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র চলছে— বহু নেতা এতে যুক্ত। দেশের মিলিটারির মধ্যে, প্রশাসনের মধ্যেও এরা বিরাট সংযোগ গড়ে তুলেছিল ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য। এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য হিটলারকে, মুসোলিনিকে মদত জোগাচ্ছে ইংল্যান্ড ফ্রান্স আমেরিকা। এটা আপনারা অনেকে জানেন না। আমি এখানে উল্লেখ করছি ত্রিপুরী কংগ্রেসে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য। তিনি বলছেন, "সো-কলড ডেমোক্রেটিক পাওয়ার, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স উইথ দি ব্যাকিং অফ আমেরিকা, কন্সপায়ারিং টু ডেসট্রয় সোস্যালিজম ইন সোভিয়েত ইউনিয়ন।" খুব উদ্বেগের সাথে বলেছেন তিনি এ কথা। প্রথম দিকে হিটলারকে মুসোলিনিকে ব্যাক করেছিল এরা, যাতে রাশিয়াকে ধ্বংস করে। আর হিটলারের ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত হল ট্রটস্কির অনুচররা এবং জিনোভিয়েভ কামেনেভ বুখারিনরা। মিলিটারির মধ্যে এদের লোক, প্রশাসন যন্ত্রের মধ্যে এদের লোক ছিল। পরিকল্পনা ছিল কিরভের পর স্ট্যালিনকে হত্যা করবে, তারপর হিটলার আক্রমণ করবে। এর মধ্যে এরা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং সোভিয়েত সরকারের পতন ঘটাবে যাতে জার্মানি রাশিয়াকে দখল করতে পারে। তারপর এরা ক্ষমতায় বসবে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য এই ছিল পরিকল্পনা। ফলে সোভিয়েতের ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়ারা এভাবেই একটা মারাত্মক আক্রমণ করল সোভিয়েত সরকারকে ধ্বংস করার জন্য। এটা হল রাশিয়ায় পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটা প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র। এই নিয়েই বিখ্যাত মস্কো ট্রায়াল হল, যা নিয়ে মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা রটনা করা হয়।

একটা রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিচার হচ্ছে, সেটা গোপনে নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাশ্যে বিচার করেছে। পৃথিবীর সব দেশের রাষ্ট্রদূতদের এবং বড় বড় আইনজীবীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য। সেখানে কোনও গোপনীয়তা ছিল না। সাক্ষ্যপ্রমাণে অপরাধীরা দোষ স্বীকার করে। আমি শুধু এক জনের কথা উল্লেখ করছি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ডেভিস। তিনি 'মিশন টু মস্কো' বইতে লিখছেন, এই রকম নিরপেক্ষ বিচার, ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত বিচার অন্য কোনও দেশে হয়নি। অপরাধীরা দোষ স্বীকার করছে। বলছেন, অপরাধীদের চেহারা দেখে এমন কোনও প্রমাণ মিলবে না যে তাদের উপর বলপ্রয়োগ হয়েছে। সেই সময়ের ব্রিটেনের একজন নামকরা আইনজীবী, ডি এন প্রিট গিয়েছিলেন লন্ডন থেকে মস্কোতে। এই বিচার দেখে তিনি কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন। এই হচ্ছে মস্কো ট্রায়াল। এরপর সেনাবাহিনীতে, প্রশাসনে এদের যারা এজেন্ট ছিল তাদের বন্দি করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যারা মারাত্মক অপরাধ করেছে তাদের ফাঁসির আদেশ হয়। এটাকে ভিত্তি করে এখনও বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম স্ট্যালিন খুনি, স্ট্যালিন নরঘাতক, স্ট্যালিন অত্যাচারী— এই অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই বিচারকে সেই সময় রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইনরা সমর্থন করেছিলেন। এ দেশের রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশি আন্দোলনের যোদ্ধারা এর কোনও বিরুদ্ধতা বা অপপ্রচার করেননি। কারণ তাঁরা এর যৌক্তিকতা বুঝেছিলেন। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেননি।

আমি প্রশ্ন করতে চাই, প্রথম মহাযুদ্ধ কারা বাধিয়েছিল— সমাজতন্ত্র, না পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ, যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, গ্রাম-শহর ধ্বংস হয়? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কারা বাধিয়েছিল? তাতেও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ প্রাণ হারায়, ব্যাপক ধ্বংস হয়। এর জন্য দায়ী কে? সাম্রাজ্যবাদ। আমি প্রশ্ন করতে চাই, এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকায় উপনিবেশগুলিকে লুণ্ঠন করেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হত্যা করেছে, ফাঁসি দিয়েছে কারা? সাম্রাজ্যবাদ। আমি প্রশ্ন করতে চাই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপান পরাজয়ের মুখে, আত্মসমর্পণের মুখে তখন হিরোসিমা নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, আরও কয়েক লক্ষ মানুষকে পুরুষানুক্রমে পঙ্গু করেছে কে? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কেন? সোভিয়েত লালফৌজ চীনকে মুক্ত করে, কোরিয়াকে মুক্ত করে জাপানের দিকে এগোচ্ছে, তাকে আটকাতে হবে— যাতে জাপান আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করে। অথচ এর কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন জাপানে বোমাবর্ষণের পরিণাম দেখে প্রচণ্ড আঘাত পান। তিনি বললেন, পরের জন্মে আমি যদি জন্মাই বিজ্ঞানী না হয়ে যেন ছুতোর মিস্ত্রি হয়ে জন্মাই। বিজ্ঞানের কী অপব্যবহার! কে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড করাল? সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ। ফ্যাসিস্ট হিটলার লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে, কমিউনিস্টকে হত্যা করেছে। এই সব নিয়ে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম ও বুর্জোয়াদের কেনা বুদ্ধিজীবীরা কোনও প্রশ্ন তোলে, আলোচনা করে? ভিয়েতনামের মানুষ প্রথমে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তারপর জাপানি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। এরপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্য নাপাম বোমা পর্যন্ত ফেলেছিল। এর চেয়ে চরম অপরাধ কী হতে পারে? সদ্য ইরাককে ধ্বংস করল কারা? মারণাস্ত্র আছে এই মিথ্যা অভিযোগ তুলে ইরাককে ধ্বংস করল। বিশ্বে আজ প্রমাণিত যে এটা মিথ্যা। লিবিয়াকে ধ্বংস করল কারা? আফগানিস্তানকে ধ্বংস করল কারা? এই তালিবান, আলকায়দা, আই এস-এর স্রষ্টা কে? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। অস্ত্র জোগাচ্ছে কে? ওরা। ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ ওরাই সৃষ্টি করেছে। এই সিরিয়াতে আক্রমণ চালাচ্ছে কারা? কই, আমাদের দেশের 'নিরপেক্ষ' সংবাদমাধ্যম তো এই সব নিয়ে উচ্চবাচ্য করে না! বিশ্বমানবতার চরম শত্রু সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলে না। কিন্তু যখন তখন মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে কালিমা লেপনের অপচেষ্টা করে। ইতিহাস এদের ক্ষমা করবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গোটা বিশ্ব তাকিয়ে ছিল মহান স্ট্যালিনের দিকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে। একমাত্র আশা, হিটলার-মুসোলিনির আক্রমণ থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে পারেন মহান স্ট্যালিন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেটা সফল করেছিল। পূর্ব ইউরোপকে মুক্ত করেছে। সেখানে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়েছিল। তখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন বলেছিল, সমস্ত সামরিক অস্ত্র বাতিল কর, সামরিক চুক্তি বাতিল কর। আমরা এর জন্য প্রস্তুত। বিশ্বকে যুদ্ধের হুমকি থেকে মুক্ত কর। এই ছিল মহান স্ট্যালিনের আহ্বান। তিনি শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সমাজতন্ত্রকে ঘিরে ন্যাটো, সিয়াটো প্রভৃতি সামরিক জোট গড়ে তুলল তখন বাধ্য হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আত্মরক্ষার জন্য ওয়ারশ চুক্তি করতে হল। এই হচ্ছে ইতিহাস।

স্ট্যালিন পার্টি চালাতেন, রাষ্ট্র চালাতেন মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী। বিদেশের যারাই তাঁকে দেখেছেন, সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। অত্যন্ত বিনয়ী, অত্যন্ত নিরহঙ্কার। সবসময় নিজেকে লেনিনের ছাত্র বলে পরিচয় দিতেন। কেউ যদি লিখতেন আমি স্ট্যালিনের ছাত্র, তবে বলতেন তুমি আমার ছাত্র হতে পার না, কারণ আমি নিজে লেনিনের ছাত্র। ছাত্রের ছাত্র হতে পার না। সব সময় এ কথা বলতেন। তিনি বলছেন, আমাকে সৃষ্টি করেছে পার্টি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। বলতেন আমার কৃতিত্ব যদি কিছু থাকে সে কৃতিত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদের, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির। চার্চিল যুদ্ধের সময় দেখা করতে গিয়েছেন, দেখে চমকে গেছেন, স্ট্যালিন বাস করছেন লন্ডনের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা যেমন ঘরে বাস করতেন সেই ধরনের ঘরে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এটা ভাবতে পারেননি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস তাঁর মেয়েকে লিখছেন, স্ট্যালিনের সম্পর্কে যত নিন্দা শোন, তার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র হচ্ছেন স্ট্যালিন। স্ট্যালিনকে দেখলে একটা অপরিচিত বাচ্চাও তার কোলে বসতে চাইবে, এমন মানুষ হচ্ছেন স্ট্যালিন। জন গাল্থার, সে যুগের নামকরা সাংবাদিক, তিনি বলছেন, মুসোলিনিকে লোকে ভয় করে, হিটলারকে অন্ধের মতো মানে, স্ট্যালিনকে মানে অন্তরের ভালবাসা এবং

ছয়ের পাতায় দেখুন

সর্বহারা বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক মহান স্ট্যালিন

পাঁচের পাতার পর

শ্রদ্ধার থেকে। এখানেই পার্থক্য। বার্নার্ড শ-কে একজন জিজ্ঞাসা করেছে, স্বাধীনতা কোন দেশে আছে? বার্নার্ড শ উত্তর দিচ্ছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে, যেখানে মহান স্ট্যালিন আছেন। এখানেই একমাত্র যথার্থ স্বাধীনতা পাবে। রমাঁ রলাঁ বলছেন, যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য কাজ করে যাব। আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্মে এবং লক্ষ্যে বিশ্বাসী। মহান স্ট্যালিন বিশ্বে একটা ধ্রুপদী যুগের সূচনা করে গেছেন, বলছেন রমাঁ রলাঁ। ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন পরাস্ত তখন সিঙ্গাপুর বেতার থেকে কী ভরসা ব্যক্ত করে নেতাজি বলেছিলেন, এখনও মার্শাল স্ট্যালিন বেঁচে আছেন, তাঁর উপরই নির্ভর করছে ইউরোপ ও বিশ্বের ভবিষ্যৎ। এঁরা কেউ কমিউনিস্ট ছিলেন না।

স্ট্যালিন অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর দেহরক্ষী আলেক্সি রিবিন লিখছেন, তিন-চারটে পোশাকের বেশি তিনি পরতেন না। ছিঁড়ে গেলে বলতেন, সেলাই করে দাও। অত বড় রাষ্ট্রনায়ক এভাবে থাকতেন। শ্রমিকের ছেলে, শ্রমিকের ছেলের মতোই জীবনযাপন করে গেছেন। এই স্ট্যালিন সম্পর্কে, আমরা যখন স্কুলের ছাত্র, গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত প্রবল চর্চা হত। দু'টি নাম আমাদের দেশে ছিল— নেতাজি আর স্ট্যালিন। এই ছিল চর্চা।

আপনারা জানেন, ভগৎ সিং মৃত্যুর আগে মার্কসবাদ জিন্দাবাদ, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান তুলেছিলেন। তিনি কমিউনিজমকে গ্রহণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বারীন ঘোষকে লিখেছেন, ভারতবর্ষের লক্ষ্য হচ্ছে আগামী দিনে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করা। এইসব দেখেই তো তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে যে এইসব আক্রমণ বুর্জোয়ারা চালাচ্ছে, অপপ্রচার চালাচ্ছে, সেটা ব্যক্তি স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে নয়, এটা হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে, সর্বহারা বিপ্লব ও প্রগতির বিরুদ্ধে, কারণ তিনি ছিলেন ও হয়ে আছেন এ সবের মূর্ত প্রতীক। আমরা জানি, মিথ্যা কিছু দিনের জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে, দীর্ঘদিন পারে না। ইতিমধ্যেই স্ট্যালিন স্বমহিমায় রাশিয়ায় ও বিশ্বে গভীর শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন।

সোভিয়েত সভ্যতা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার ভিত্তিতে মানব ইতিহাসে একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। আবার এটাও ঠিক, প্রতিবিপ্লবের ফলে সোভিয়েত সমাজের অস্তিত্ব আজ আর নেই। আমরা দুঃখিত, ব্যথিত কিন্তু আমরা হতাশ নই। আমি ইতিহাসের শিক্ষা থেকে একটা কথা বলতে চাই, কোনও নতুন আদর্শ, আন্দোলনকে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে হলে, দীর্ঘদিন তার জয়-পরাজয়, সফলতা-বিফলতা থাকে। ধর্মীয় আন্দোলন দাবি করত তারা ঈশ্বরের শক্তিতে বলীয়ান। কোনও ধর্মীয় আন্দোলনই হঠাৎ করে জয়লাভ করেনি। খ্রিস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বুদ্ধদেব অবশ্য ঈশ্বর মানতেন না, তিনি একটা আদর্শ প্রচার করেছিলেন, বুদ্ধের আদর্শের প্রচার, হিন্দুধর্মের বেদান্তের প্রচার— এ সবের প্রতিষ্ঠা করতে বহু বছর ধরে জয়-পরাজয়, বহু লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এটাই হচ্ছে ইতিহাস। আজ যেটাকে আমরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র বা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বলি, তার ইতিহাস কী? পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে নবজাগরণের সূচনা, আর পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি সফল হয় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে। চূড়ান্ত জয়ের জন্য প্রায় তিনশো সাড়ে তিনশো বছর লেগেছে। নবজাগরণের পর্যায় অতিক্রম করার পর কখনও পার্লামেন্ট আসছে, কখনও রাজতন্ত্র আসছে, আবার পার্লামেন্ট আসছে আবার রাজতন্ত্র আসছে। ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ুন, ফ্রান্সের ইতিহাস পড়ুন, তা হলে এ সব দেখবেন। তারপর পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি স্থায়ী হল।

ধর্মীয় আন্দোলনও শোষণ উচ্ছেদের আন্দোলন ছিল না। একটা শোষণের পরিবর্তে আর একটা শোষণ এনেছে। দাসপ্রভুর পরিবর্তে রাজতন্ত্র এনেছে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের পরিবর্তে পুঁজিবাদী শোষণ এনেছে। আর, সমাজতন্ত্র হচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের জন্য শোষণ উচ্ছেদ করা। তার মানে কয়েক হাজার বছরের যে শোষণ ব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রকে লড়তে হয়েছে, তাতে কয়েক হাজার বছরের বিরুদ্ধে সত্তর বছর কতটুকু! এ কথা আপনাদের বুঝতে হবে।

দ্বিতীয়ত বুঝতে হবে, মহান মার্কস নিজে বলেছেন, কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ সমাজতন্ত্র একটা ট্রানজিশনাল স্টেজ বা অন্তর্বর্তী স্তর। এই অন্তর্বর্তী স্তরে সঠিক পথে চললে পুঁজিবাদের থেকে কমিউনিজমের দিকে এগোতে পার, আবার ভুল করলে, অসতর্ক থাকলে পুঁজিবাদ ফিরেও আসতে পারে। মার্কস বলছেন, কমিউনিজমের প্রথম স্তর যেটা সমাজতন্ত্র, এর অর্থনৈতিক কাঠামো হচ্ছে পুঁজিবাদী। এ জন্ম নিচ্ছে ইন্টেলেকচুয়ালি, পলিটিকালি, ইকোনমিকালি উইথ দি বার্থ মার্ক অফ ক্যাপিটালিজম। বলছেন, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের জঠর-চিহ্ন নিয়ে জন্ম নিচ্ছে বুদ্ধিগত দিক থেকে, রাজনীতিগত দিক থেকে, অর্থনীতিগত দিক থেকে। আর এক জায়গায় বলছেন, যতক্ষণ সাম্যবাদ না আসছে, ততক্ষণ বুর্জোয়া ল থাকছেই। বলছেন, শ্রমবিভাগের দাসত্ববৃত্তি থেকে যতদিন মানুষ মুক্ত না হচ্ছে, মানসিক শ্রম আর কায়িক শ্রমের পার্থক্য থেকে না মুক্ত হচ্ছে তত দিন বুর্জোয়া ল থাকছে। বলছেন, শুধু বেঁচে থাকার জন্য কাজ করব, এর পরিবর্তে মানুষের মন হবে সমাজের অগ্রগতির জন্য কাজ করব। যতক্ষণ তা না হচ্ছে এবং যতক্ষণ উৎপাদনের প্রাচুর্য না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বুর্জোয়া ল থাকছেই। এই হল মার্কসের কথা।

লেনিন বলেছেন, বিপ্লবের আগে ক্ষমতাসীন পুঁজিপতিদের যে প্রতিরোধ শক্তি থাকে বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লবে তা দশগুণ, শতগুণ, সহস্রগুণ বেড়ে যায়। বলেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের চিন্তা ভাবনা সংস্কৃতির মধ্যে পুঁজিবাদ অভ্যাসের শক্তি রূপে থেকে যায়। স্ট্যালিনও শেষ জীবনে আসন্ন বিপদ বুঝে সতর্ক করে গিয়েছিলেন। স্ট্যালিনের মৃত্যুর আগে শেষ যে পার্টির অধিবেশন হয়, যেটা ঊনবিংশ কংগ্রেস, সেখানে এতটা উদ্বেগের কথা বলেছেন, যা এর আগে কখনও বলেননি। অথচ স্ট্যালিন যখন গোটা বিশ্বে বন্দিত, সমগ্র বিশ্ব স্ট্যালিনের দিকে তাকিয়ে আছে, সমাজতন্ত্রের জয়জয়কার চলছে, সোভিয়েত ইউনিয়নেরও ব্যাপক অগ্রগতি ঘটছে, সেই সময় উদ্বিগ্ন মহান স্ট্যালিন। তিনি বলছেন, কর্মীদের মধ্যে আদর্শগত চর্চা কমে গেছে। একটা আত্মসন্তুষ্টির মানসিকতা— যুদ্ধের পর মনে হচ্ছে যেন বিশ্ব জয় করে ফেলেছি— এরকম ভাব এসে গেছে। ফলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চর্চা অনেক কমে গেছে। এটা উদ্বেগের। তিনি বলছেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের চর্চা যদি কমে, বুর্জোয়া আদর্শের প্রভাব বাড়বে। তার ফলে অপূরণীয় ক্ষতি হবে রাষ্ট্র এবং পার্টির। লক্ষ করুন, বলছেন, অপূরণীয় ক্ষতি হবে। ঘটলও তাই। ১৯৫২ সালে কমরেড স্ট্যালিন এ কথা বলছেন। বলছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানসিকতা রয়ে গেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংস্কৃতি ও রুচির প্রভাব রয়ে গেছে। কমরেড স্ট্যালিন বলছেন, লেনিনবাদ বিরোধী গ্রুপ দেশের ভিতরে সক্রিয়। নানা জায়গায় তারা সক্রিয়। বাইরে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাহায্য করছে। ফলে এদের সম্পর্কে সজাগ থাকা দরকার। এটা বোঝা যাচ্ছিল তিনি এই বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাশিয়ায় যা ঘটল, এটাও একটা প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ। একটা আক্রমণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ঘটেছিল, যেটা আমি আগে উল্লেখ করে গেছি, বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের সাহায্য নিয়ে দেশের পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবীরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য করেছিল। যেটা ধরা পড়ল, ট্রায়াল হল। ফলে সেই প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র পরাস্ত হল। কিন্তু আর একটা আক্রমণ ঘনীভূত হচ্ছিল স্ট্যালিন বুঝতে পারছিলেন। তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাতে বাধা দেয়। যারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এই শক্তি কারা? এই শক্তি হচ্ছে, প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া শক্তি। না বুঝেও তাদের দ্বারা বিপথে চালিত হয় জনগণ। কারণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ করতে করতেই এই আক্রমণ করা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে ধরুন কুড়ি কোটি লোক, তার মধ্যে দু'কোটি কমিউনিস্ট। বাকি আঠারো কোটি তো কমিউনিস্ট নয়। তার মানে তারা মার্কসবাদী নয়। তারা যদি মার্কসবাদী না হয় তা হলে তাদের চিন্তা কীসের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে? বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা। তারা সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করছে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে, আচারে-আচরণে, সংস্কৃতিতে তারা বুর্জোয়া চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। দ্বিতীয়ত, দু'কোটি কমিউনিস্ট তো সব লেনিন-স্ট্যালিন নয়। আমাদের দলেও কি সব শিবদাস ঘোষ? স্তরে স্তরে পার্থক্য থাকে। যতটা পার্থক্য থাকে ততটা পুঁজিবাদের প্রভাব থেকে যায়। পার্টির মধ্যেও তার প্রভাব থাকে। আমি কমিউনিস্ট, আমার বাবা-মা কমিউনিস্ট নয়, আমার স্ত্রী নয়। তাদের সাথে আমার সম্পর্ক আছে। আমার মধ্যে তার প্রভাব থাকে। এগুলো বাস্তব সমস্যা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মূলত সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানা কিছুটা কালেক্টিভ ফার্মে ছিল। ফসলের মালিকানা চাষিদের ছিল। তারা রাষ্ট্রকে বিক্রি করত। মানি সার্কুলেশন ছিল, কমোডিটি সার্কুলেশন ছিল, ল অফ ভ্যালু কাজ করত। এগুলি সব বুর্জোয়া অর্থনীতির নিয়ম। আমার আয় আমারই আয়— এই ছিল, বা আমার বংশধর সেটা পাবে, এটা ছিল। তারপর যাদের বাড়ি দেওয়া হয়েছে তাদের বাড়ির সাথে লাগোয়া একটা জমি পেত পশুপালনের জন্য। এটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এসব কিছু কিছু বুর্জোয়া সম্পত্তির রেশ ছিল অর্থনীতির ক্ষেত্রে। যদিও আস্তে আস্তে কমছিল। যেটা কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশেষ ভাবে দেখালেন তা হল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানা মূলত প্রতিষ্ঠিত হলেও, উপরকাঠামোতে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, ভাবজগতে পুঁজিবাদের প্রভাব ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজে। যেটা মার্কসেরও ওয়ার্নিং ছিল বার্থ মার্ক হিসাবে। লেনিনও বলেছেন, ফোর্সেস অফ হ্যাবিট— ইট ইজ এ টেরিফিক ফোর্স অফ মিলিয়নস অফ পিপল। অভ্যাসের শক্তি মানে বুর্জোয়া অভ্যাসের শক্তি, সামন্ততন্ত্রের অভ্যাসের শক্তি। এগুলি রয়ে গেছে। এগুলি রয়ে গেছে ব্যাপক ভাবে। আপনারা জানেন, কয়েক হাজার বছর আগে আমাদের দেশে কাস্ট বিভাজন করা হয়েছিল। কত সংস্কার আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু আজও ভয়ঙ্কর রূপে তা রয়ে গেছে। কয়েক শত বছর ধরে বিশ্বে জাতিবিদ্বেষ, বর্ণ বিদ্বেষ, ধর্ম বিদ্বেষের বিষ রয়ে গেছে। আর সম্পত্তির মালিকানাবোধ তো দাসপ্রথার যুগ থেকে। ফলে কয়েক হাজার বছর ধরে অভ্যাসের শক্তি হিসাবে এটা রয়ে গেছে। এ একটা দিক— তা হল ব্যক্তিগত ভাবে মালিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজতন্ত্রেও সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়নি। এখানে আরেকটা পয়েন্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ তুলেছিলেন, যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৮ সালে আমাদের পার্টি গঠনের সময়েই তিনি বলেছিলেন, সমাজের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ— এই স্লোগানটা ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান। বুর্জোয়া মানবতাবাদের স্লোগান। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্লোগান তাই ছিল। দেশের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ। কিন্তু ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ হলেও ব্যক্তির স্বার্থ তো থেকে যাচ্ছে। থেকে যায়। তিনি বলছেন, এই যুগে কমিউনিস্ট হতে হলে, উন্নত কমিউনিস্ট হতে হলে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং ব্যক্তিগত মালিকানা একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়েছে, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেছে, সেই দেশে এই নৈতিকতা এখন আর কাজ করবে না। কারণ ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত। সেটা এখন সুবিধায় পর্যবসিত। ফলে ব্যক্তিগত ভাবে দেশের জন্য, বিপ্লবের জন্য ত্যাগ স্বীকার করলাম, বিনিময়ে ব্যক্তি হিসাবে কী পেলাম, এই প্রশ্ন এসে যায়। সোভিয়েতে এবং চীনে বিপ্লবটা হয়েছে একটা পিছিয়ে পড়া দেশে। রাশিয়ায় যখন বিপ্লব হয় তখন পুঁজিবাদ উন্নত হয়নি, পুঁজিপতি শ্রেণি ক্ষমতায় এসেছে, এই পর্যন্ত। এরই ভিত্তিতে লেনিন বললেন, বিপ্লব যেহেতু রাষ্ট্র উচ্ছেদের বিপ্লব এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত, ফলে সেই অর্থে এটা পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বাকি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কাজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পূরণ করবে। এর পর তিনি ওয়ার কমিউনিজম, নিউ ইকোনমিক পলিসি এইসব কার্যকর করেছিলেন এই পিরিয়ডে। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সুর যুক্ত ছিল। ফলে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সামনেও আদর্শ হিসাবে ছিল বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ।

চীনে ছিল সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে। সেখানেও বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ— এই আদর্শ কাজ করেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, উন্নত পুঁজিবাদী দেশে কমিউনিস্টদের উন্নত স্তরে পৌঁছতে হলে চরিত্রের এই মানে চলবে না। সেখানে ব্যক্তিকে ব্যক্তিস্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে, শুধু সম্পত্তি পরিত্যাগ করা নয়, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা— জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ থেকে মুক্ত হতে হবে এবং সামাজিক স্বার্থের সাথে, বিপ্লবের স্বার্থের সাথে, দলের স্বার্থের সাথে একাত্ম হতে হবে, বিলীন হতে হবে। তিনি বললেন, রাশিয়া এবং চীনে বিপ্লবের পরে এটা প্রয়োজন ছিল। তিনি বললেন, যে আদর্শের দ্বারা বিপ্লব হয়েছে সে আদর্শের দ্বারা সমাজতন্ত্র রক্ষা পেতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ হিসাবে পুরনো বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ নতুন রূপে আসছে। ব্যক্তি ত্যাগের বিনিময়ে সমাজতন্ত্র থেকে সুবিধা পেতে চাইছে। যেখানে হওয়া উচিত ছিল, সোভিয়েত জনগণ বিশ্ববিপ্লবের জন্য কাজ করবে,

সাতের পাতায় দেখুন

বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এগিয়ে যাবে

ছয়ের পাতার পর

সমাজতন্ত্রকে কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তার পরিবর্তে ব্যক্তিগতভাবে আমি কী পেতে পারি, এই আকাঙ্ক্ষা বেড়ে উঠছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ একে সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ আখ্যা দিয়ে সমাজতন্ত্রে এটা একটা নতুন বিপদ রূপে দেখালেন, যেটা প্রতিবিপ্লবকে সাহায্য করেছে।

আরেকটা কথা তিনি বলেছিলেন, লেনিনের পর কমিউনিস্ট মুভমেন্টের সামনে যে সমস্ত প্রশ্ন এসেছে, বিজ্ঞানের যে সমস্ত নতুন অবদান এসেছে, সেগুলিকে ভিত্তি করে আজকে লেনিনবাদকে যেভাবে বিকশিত করার দরকার ছিল, তা করা হয়নি। যদিও একথা ঠিক, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য কমরেড স্ট্যালিন যেভাবে ব্যস্ত ছিলেন, প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র দমনে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেভাবে ব্যস্ত ছিলেন, হয়ত তার জন্য সম্ভব হয়নি। যদিও জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি হাত দিয়েছিলেন এবং কিছু মূল্যবান অবদানও তিনি রেখে গেছেন। ১৯৪৮ সালে কমরেড ঘোষ আর একটা ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে, সাংগঠনিক বিস্তারের জন্য কমিউনিস্ট মুভমেন্টে যত জোর দেওয়া হয়েছে, আদর্শগত চর্চার উপর তত জোর দেওয়া হয়নি। ফলে আদর্শগত মান উন্নত হয়নি। এর ফলে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে সোভিয়েত পার্টিতে, বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনে যান্ত্রিক সম্পর্কের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেছেন, উপরোক্ত কারণগুলির জন্যই বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে সংশোধনবাদ শক্তিশালী হতে পেরেছে।

আরেকটা কথা হচ্ছে, যে জনগণ ১৯১৭ সালে বিপ্লব করেছিল, তারা দেখেছে দারিদ্র, অনাহার, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু। তাদের কাছে বিপ্লব একটা মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছিল। আর '৪০ সালে, '৫০ সালে যে মানুষ— তৃতীয়, চতুর্থ প্রজন্ম— এরা সে রাশিয়া দেখেনি। এরা দেখেছে সমৃদ্ধ রাশিয়া। ফলে বিপ্লবের প্রতি সে আবেগ তাদের নেই, তা থাকে না যদি সঠিক ভাবে আবেগের সাথে আদর্শের চর্চা না করা হয়, ইতিহাসের চর্চা হয়। যেমন আমাদের দেশে স্বদেশি আন্দোলন নিয়ে সে আবেগ আজ নেই। ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, প্রীতিলতা নিয়ে, সুভাষচন্দ্র নিয়ে এখনকার প্রজন্মের সে আবেগ নেই। চর্চা না থাকলে, সঠিক মূল্যায়ন না হলে 'জেনারেশন গ্যাপ' হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নেও এটা ঘটেছে। নতুন জেনারেশনের অনেকেই সমাজতন্ত্রকে ভোগবাদের সুবিধা হিসাবে নিয়েছে। এর মধ্যে বহু বুদ্ধিজীবীও ছিল। তাদের মধ্যে সর্বহারা গণতন্ত্র বিরোধী বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদী অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠেছিল, যেটা সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ থেকে এসেছে। এসব বিরাট ক্ষতি করেছে।

আরেকটা হচ্ছে, বিপ্লবের আগে যারা কারখানার মালিক ছিল, জমিতে কুলাক ছিল, তাদের বংশধররা ছিল, তাদের মধ্যে নিজেদের পুরনো সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ করতে করতেই, সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ করতে করতেই তারা এই আকাঙ্ক্ষা লালন-পালন করছিল। এরা অনেকেই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিল। এই শক্তি বার বার চেষ্টা করেছিল নানা ভাবে গোপনে ষড়যন্ত্র করে সমাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার। তা ছাড়া জনগণের মধ্যে সব সময়ই তত্ত্ব চর্চা করায় অনীহা থাকে। ফলে তারা যে অজ্ঞাতসারে বুর্জোয়া চিন্তা, সংস্কৃতির ভিকটিম হচ্ছে, বুঝতে পারে না। নেতৃত্ব বারবার তত্ত্ব চর্চা করার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও এই বদ অভ্যাস ছাড়তে পারে না। এই সবটা মিলিয়ে, অর্থাৎ একটা হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আরও বিকাশ করার দরকার ছিল, যেটা ঘটেনি, দ্বিতীয়ত সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ একটা সমস্যা হিসাবে এসে গিয়েছিল, যেটার সঠিক সমাধান দেওয়া হয়নি, তৃতীয়ত, জনগণের মধ্যে পুরনো বুর্জোয়া, সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা, চিন্তাভাবনার ব্যাপক প্রভাব ছিল। এসবকে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবীরা অতি সংগোপনে সূক্ষ্মভাবে কাজে লাগিয়েছে। তারা বুঝেছিল স্ট্যালিনের জীবদ্দশায় প্রতিবিপ্লব সম্ভব নয়। কারণ স্ট্যালিন আর সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমার্থক হয়ে গিয়েছিল সোভিয়েত জনগণের কাছে। তাঁর প্রতি প্রবল আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। যদিও এটা সচেতনতাপ্রসূত ছিল না। ক্রুশ্চেভ এই প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের প্রতিনিধি হিসাবেই স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করল সমাজতন্ত্রকে ধাপে ধাপে ধ্বংস করার জন্য। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ মানে লেনিনবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ, যার দ্বারা সংশোধনবাদী পথে সমাজতন্ত্রকে আঘাত করা হয়েছিল, যা ধ্বংস করল এক মহান সভ্যতাকে, যে সভ্যতা সত্তর বছর বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল এবং মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশাল অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখে গেছে।

আবার এটাও ঠিক, বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লব এই মহান সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে। এখানে আপনাদের স্মরণ করাতে চাই, এক সময় রমাঁ রলাঁ বলেছিলেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ধ্বংস হলে শুধু রাশিয়ার শ্রমিকরাই ক্রীতদাস হবে না, বিশ্বে কয়েক যুগ অন্ধকার নেমে আসবে। ঘটলও তাই। যতদিন শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা ছিল, ততদিন দেশে দেশে শুধু বিপ্লবী আন্দোলনই নয়, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, যুদ্ধ বিরোধী শান্তি আন্দোলন সহ নানা প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী ছিল, মূল্যবোধের চর্চা ছিল। আজ সবই বিনষ্ট হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ সৃষ্ট জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষের আগুন, ধর্মীয় মৌলবাদ, ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ, নৃশংস গণহত্যা, গণতান্ত্রিক চেতনার অবলুপ্তি, মূল্যবোধের অবলুপ্তি সব দেশেই ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করেছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তানকে ধ্বংস করতে পারত না। সিরিয়ার উপর হামলা চালাতে পারত না। যেমন বিগত শতাব্দীতে পাঁচের দশকে মিশরের উপর আক্রমণ শুরু করেও সোভিয়েতের আলটিমেটামে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল।

এই অবস্থায় এটা মর্মান্তিক বেদনার যে, সেই সমাজতন্ত্র প্রতিবিপ্লবী আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এতে হতাশার কোনও স্থান নেই। আমি আগেই বলেছি, ধর্মীয় আন্দোলন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এক ধরনের শোষণের পরিবর্তে আর এক ধরনের শোষণ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সত্ত্বেও চূড়ান্ত জয়ের জন্য কয়েক শত বছর লেগেছে। সেখানে হাজার হাজার বছরের শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সত্তর বছর কতটুকু সময়! ফলে কী কী কারণে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় হল এর থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে আমাদের বিপ্লব করতে হবে। যেমন ১৮৭১ সালে ফ্রান্সে শ্রমিক অভ্যুত্থানে প্যারি কমিউন তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল। তারপর তাকে বুর্জোয়ারা ধ্বংস করেছিল। এর থেকে মার্কস শিক্ষা নিয়ে বলেছিলেন, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস না করলে শ্রমিক বিপ্লব জয়যুক্ত হবে না। লেনিন তাই কার্যকর করেছিলেন। আগামী দিনে কমিউনিস্টরাও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজতন্ত্রকে প্রতিবিপ্লব থেকে রক্ষা করে এগিয়ে যাবে। আর সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় হতে দেবে না। ফলে আজ আমরা কী করব? আমাদের সামনে দু'টি পথ আছে। হয় বিশ্বে ও আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ টিকে থাকুক, শোষণ অত্যাচার চলুক, বেকারত্ব বাড়ুক, ছাঁটাই বাড়ুক, অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বাড়ুক, আত্মহত্যা বাড়ুক,

আটের পাতায় দেখুন

কমরেড সুনীল মুখার্জীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য, পুরুলিয়া জেলা কমিটির পূর্বতন সম্পাদক কমরেড সুনীল মুখার্জী বার্ধক্যজনিত কারণে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে ১১ নভেম্বর, সকাল ৯ টায় ধানবাদ জেলার পাতলাবাড়িতে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্য প্রয়াত কমরেড প্রীতীশ চন্দের সংস্পর্শে এসে কমরেড সুনীল মুখার্জী ১৯৫৭-'৫৮ সালে সর্বহারার মহান নেতা এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ধীরে ধীরে পার্টি কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

তিনি রেল কর্মচারী হিসাবে পুরুলিয়া জেলার আদ্রাতে কর্মরত ছিলেন। রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য প্রয়াত কমরেড নির্মল মণ্ডল, পুরুলিয়া জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রয়াত সদস্য কমরেড ভাস্কর ভদ্র এবং দলের প্রয়াত নেতা ও রেল কর্মচারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী প্রয়াত কমরেড মালতী চক্রবর্তী সহ অনেক রেলকর্মী কমরেড সুনীল মুখার্জীর সাথে যোগাযোগের সূত্রে দলের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই তিন জন কমরেড পুরুলিয়া জেলার উত্তরাংশে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

পুরুলিয়া জেলায় প্রথম দিকে সংগঠনের কাজ শুরু হয় গরিব চাষি, খেতমজুর, দিনমজুর, বিড়ি শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক, মুটে মজদুরদের মধ্যে। পুরুলিয়া গরিব মানুষ অধ্যুষিত অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জেলা। এই জেলায় সংগঠনের গোড়ার দিকে গ্রামে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া ছিল খুবই দুরূহ। সে সময়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সরকারি কর্মচারীর সচ্ছল জীবন ত্যাগ করে কমরেড সুনীল মুখার্জী পার্টি সংগঠনের কাজে গরিব পাড়ায় থেকে খাওয়া জুটুক না জুটুক আনন্দের সাথে দলের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। পার্টি নেতৃত্ব যখন যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, তখনই সে কাজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দরদি মন, সততা, নিষ্ঠা, দলের প্রতি আনুগত্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারাই তিনি দলের মধ্যে ও দলের বাইরে সাধারণ মানুষের খুব আপনজন হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দক্ষিণপূর্ব রেলে চাকরিরত অবস্থায় রেল শ্রমিক ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। রেল শ্রমিক আন্দোলনে, বিশেষ করে ১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটে তিনি নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। এই ভূমিকার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ বার বার তাঁকে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু তিনি বলতেন, সাসপেন্ড হলে কাজের সময় আরও বেশি পাওয়া যায়। সাসপেন্ড হওয়া, বেতন কাটা বা শাস্তি নিয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যেত না। বয়সে ছোটদের অধীনে কাজ করতেও তাঁর অসুবিধা হত না। রাজ্য কমিটির সদস্য হিসাবে পুরুলিয়া জেলায় গিয়ে বয়সে অনুজ জেলা সম্পাদকের নেতৃত্বেও তিনি কাজ করেছেন।

১৯৬৭ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি দলের পুরুলিয়া জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি রাজ্য কমিটিরও সদস্য ছিলেন। ১৯৮৭ সালে তিনি রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। তিনি এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং পরবর্তীকালে সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১০ সাল থেকে তিনি নানা রোগে আক্রান্ত হতে থাকেন। ধারাবাহিকভাবে চিকিৎসাও চলছিল। বার্ধক্যজনিত রোগে তিনি ক্রমশ কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকেন এবং শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। শেষপর্যন্ত চিকিৎকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে ১১ নভেম্বর তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর তাঁর বাসভবন থেকে তাঁর দেহ রঘুনাথপুর শহরে দলীয় কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। জেলার সর্বত্র দলের কর্মী সমর্থক দরদি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে দলের রাজ্য দপ্তর সহ রাজ্যের সর্বত্র দলীয় কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয় এবং নেতা-কর্মীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন। রঘুনাথপুর দলীয় কার্যালয়ে তাঁর মরদেহে দলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ, গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ অগণিত সাধারণ মানুষ।

তাঁর মরদেহ নিয়ে অশ্রুসজল চোখে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দলের কর্মী সহ সাধারণ মানুষ শেষযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তাঁকে শেষ বিদায় জানানো হয়।

পুরুলিয়া শহরের হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে কমরেড সুনীল মুখার্জী স্মরণে সভা ২ ডিসেম্বর। বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা এবং দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ।

কমরেড সুনীল মুখার্জী লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

নভেম্বর বিপ্লব শোষণমুক্তির সংগ্রামের ধ্রুবতারা

সাতের পাতার পর

নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা বাড়ুক, মনুষ্যত্ব ধ্বংস হোক, মূল্যবোধ ধ্বংস হোক, বিবেক ধ্বংস হোক, গণধর্ষণ ও হত্যা বাড়ুক, শিশুকন্যা ধর্ষণ বাড়ুক, বৃদ্ধ নারী ধর্ষণ বাড়ুক— এটাই চলতে থাকবে, বাড়তে থাকবে। না হয়, এর হাত থেকে আমরা মুক্তি চাইব। সেই মুক্তির পথ কী? সোভিয়েত বিপ্লব দেখিয়ে গেছে মহান নভেম্বর বিপ্লবই সেই মুক্তির পথ।

আজ মানবসভ্যতা চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে। এই ব্যবস্থা পচা গলা মৃতদেহ, দুর্গন্ধময়। বৃদ্ধ বাবা-মাকে গলা টিপে হত্যা করছে সন্তান সম্পত্তির লোভে। স্বামী স্ত্রীকে খুন করছে, স্ত্রীকে বিক্রি করে দিচ্ছে। এই তো পুঁজিবাদ! কোথায় মানবিকতা, কোথায় মনুষ্যত্ব, কোথায় রুচি-সংস্কৃতি! বুর্জোয়া দলগুলো ক্ষমতালিপ্সু। তাদের একমাত্র লক্ষ্য মাল্টিন্যাশনাল, কর্পোরেট সেক্টর, মনোপলিস্ট ক্যাপিটালিস্টদের সেবা, তাদের গোলামি করা। আর গদিতে বসে তারাও কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে, কালো টাকার কারবার করছে। এই কিছুদিন আগে পানামা পেপার্স বেরিয়েছে। সদ্য প্যারাডাইস পেপার্স বেরিয়েছে। বিশাল কালো টাকার কেলেঙ্কারি। ভারতবর্ষের ৪১৭ জন রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, শিল্পপতির নাম আছে। বিশ্বেরও বহু শিল্পপতি, রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীর নাম আছে। সুইস ব্যাঙ্ক এক হাজারের বেশি ভারতীয় কালো টাকার কারবারিদের নাম দিয়েছে। সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে? সবাই শুধু বক্তৃতায় ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছে। যত দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলছে ততই দুর্নীতি বাড়ছে, এরা নিজেরাই দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আমরা কি এটা চলতে দেব? তা হলে ভবিষ্যৎ কী? একমাত্র মুক্তির পথ নভেম্বর বিপ্লব— সমাজতন্ত্র। এটা আশার কথা, অত্যাচারিত মানুষ মাঝে মাঝে মাথা তুলছে। বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। আমেরিকায় অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট শুধু একবার নয়, বার বার মাথা তুলে দাঁড়াবে। এই আন্দোলন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ইউরোপে, ইংল্যান্ডে, জার্মানিতে, ইটালিতে, গ্রিসে, ফ্রান্সে বার বার শ্রমিক ধর্মঘটের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে কৃষকরা বিদ্রোহ করছে, গুলির মুখে দাঁড়িয়ে লড়ছে। শ্রমিকরা লড়ছে। ছাত্ররা লড়ছে। বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ সর্বত্র। তারা পরিবর্তন চায়। প্রতিকার চায়। মুক্তি চায়। কিন্তু কোথায় পরিবর্তন, কোথায় মুক্তি! এই পথ তাদের জানা নেই। এই পথ দেখাতে পারে একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা। এই পথ দেখাতে পারে মহান নভেম্বর বিপ্লব। এটা এ দেশে সংগঠিত করা আমাদের দলের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। যার জন্য আমরা সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা দায়সারা গোছের একটা হল মিটিং করে এই বিপ্লব শতবার্ষিকী উদযাপন করিনি। একটা বছর ধরে গোটা ভারতবর্ষব্যাপী আমরা প্রচার করেছি। এটা খুব আনন্দের কথা, আশার কথা, নভেম্বর বিপ্লবের প্রচার দেখে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছে। আমাদের সমর্থন করেছে, চাঁদা দিয়েছে। এ সব দেখে আমরাও অনুপ্রাণিত হয়েছি।

ফলে আজ পুনরায় এ কথা বলতে চাই, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ আজ অন্তিম স্থানে উপনীত। এই শব দাহ করতে পারে একমাত্র সচেতন শ্রমিক শ্রেণি, যদি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা সংঘবদ্ধ হয়, উন্নত নৈতিকতার আধারে প্রথমে গণকমিটি, পরে বিপ্লবী কমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী যদি গড়ে তুলতে পারে। অবশ্য প্রথমে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে অন্যান্য সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলোর সাথে যুক্ত আন্দোলন করে তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সমগ্র জনগণের উপর বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এই পথে অগ্রসর হতে হবে। ভারতবর্ষের বুকে এই কাজটি আমাদের করতে হবে। শ্রেণি সংগঠন, গণআন্দোলন গড়ে তোলা, শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। মহান লেনিন বলেছেন, নির্বাচনে লড়বে, এমএলএ-এমপি হবে কিন্তু বাইরে শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। নির্বাচনের পথে বিপ্লব হয় না— এটা তাঁর শিক্ষা। যে পথ সিপিএম-সিপিআই গ্রহণ করেনি। যার ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ যুক্তফ্রন্টের সময়ে বলেছিলেন, আমরা যারা বামপন্থী, তারা সরকার চালাব— বুর্জোয়া সরকারের পথে নয়। আমরা সরকার চালাব শ্রেণিসংগ্রামকে, গণআন্দোলনকে জোরদার করার জন্য। লেনিনের সময় সরকার গঠনের প্রশ্ন ছিল না, তাই তিনি এ কথা বলেননি। লেনিনের শিক্ষাকে আরও ডেভেলপ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ এ কথা বলেছিলেন, সরকার গড়লেও একই উদ্দেশ্যে এই সরকার শ্রেণিসংগ্রামকে তীব্রতর করার জন্যই কাজ করে যাবে। এই প্রশ্নেও সিপিএমের সাথে আমাদের তীব্র মতভেদ হয়েছিল। ৩৪ বছর ধরে তারা পশ্চিমবঙ্গে বুর্জোয়া সরকারের মতোই শ্রেণি সংগ্রাম ও গণআন্দোলন বিরোধী ভূমিকা নেওয়ায় একদা ভারতবর্ষের বামপন্থী আন্দোলনের কেন্দ্র বলে পরিচিত এই রাজ্যের হাল কী হয়েছে, সকলেই দেখছেন। সিপিএমের কর্মী-সমর্থক যাঁরা এই মিটিংয়ে উপস্থিত, তাঁরাও নিশ্চয়ই বুঝছেন।

তা হলে আমরা গণআন্দোলন করব নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে। শ্রমিকের শ্রেণিসংগ্রাম, গরিব কৃষকের শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলব, নির্বাচনেও লড়ব বিপ্লবী লক্ষ্য নিয়ে। এই আন্দোলনে অন্য দল সাথী হলে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলব। আবার একই সাথে যেমন প্রতিবেশী বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, সৌভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা সাহায্য করে যাব, সমর্থন করে যাব, আবার আরও নানা দেশে যারা কমিউনিস্ট মুভমেন্টের উদ্যোগ নিচ্ছে তাদেরও সাহায্য করে যাব আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি দায়বদ্ধ হয়ে। আমি যে কথা বলতে চাই এবং যেটা দিয়ে বক্তব্য শেষ করতে চাইছি— অল রোডস লিড টু নভেম্বর রেভলিউশন। ক্যারি ফরোয়ার্ড দি মেসেজ অফ নভেম্বর রেভলিউশন। লং লিভ মার্কসইজম-লেনিনইজম-শিবদাস ঘোষ থট। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। লং লিভ প্রোলেটারিয়ান ইন্টারন্যাশনালিজম। লং লিভ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি। রেড স্যালুট টু বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী), রেড স্যালুট টু গ্রেট মার্কস-এঙ্গেলস- লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙ-শিবদাস ঘোষ।

প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করতে হবে

২৯ মে ২০১৭। পাশফেল চালুর দাবিতে বিধানসভার সামনে ছাত্রবিক্ষোভ

একের পাতার পর

তৃণমূল সরকারের শাসনেও সমানভাবে পরিচালিত হয়েছে। এই দাবিতে সর্বশেষ গত ১৭ জুলাই পশ্চিমবাংলায় ১২ ঘণ্টার বনধ আহ্বান করা হয়, যার পক্ষে বিপুল জনসমর্থন টের পেয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন যে, সামনের শিক্ষাবর্ষ থেকেই তাঁরা পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনবেন। পাশ-ফেল প্রথা না থাকার কারণে এ রাজ্যের কোটি কোটি গরিব-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সর্বনাশা ক্ষতি হয়েছে। জনগণের এই ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের বরাবরের দাবি অনুযায়ী সরকারকে প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশফেল ফিরিয়ে আনতে হবে।

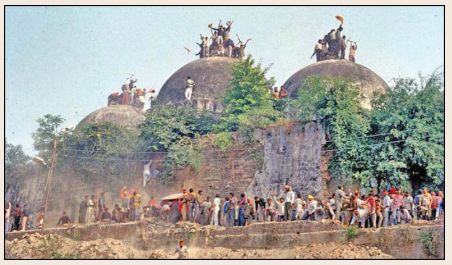

৬ ডিসেম্বর সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস পালন করুন

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িক আরএসএস-বিজেপির হাতে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়।
পাড়ায়, হাটে-বাজারে, স্টেশনে, বাসস্ট্যান্ড সহ সর্বত্র
সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ৬ ডিসেম্বর কালা দিবস পালন করুন

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ভাষণ

একের পাতার পর

করেছে। আজ হাজার হাজার কমরেড কষ্ট করে এখানে এসেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের নিজের হাতে গড়া পার্টি আজকে কত বড় হয়েছে দেখে গৌরব বোধ করছি। আমি সকল কমরেডকে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র পক্ষ থেকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই।

রাশিয়ার মেহনতি মানুষ, কুলি-মজুররা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে মহান লেনিনের নেতৃত্বে যে বিপ্লব করেছিল তা দুনিয়াকে হতবাক করে দিয়েছিল। কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয় সেই শিক্ষা বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার মধ্যে দিয়েই তারা পেয়েছিল। কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সেই দেশের শোষিত মানুষকে সকল রকমের শোষণের হাত থেকে বাঁচার রাস্তা দেখিয়েছে। কমরেড লেনিনের সুযোগ্য সহযোদ্ধা কমরেড স্ট্যালিন— বিপ্লব বাস্তবায়নের রূপকার, এইরকম একটা শক্তিশালী অভ্যুত্থানের পরে সমস্ত দিক থেকে রাশিয়ার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন এবং দুনিয়ার সব থেকে শক্তিশালী দেশে পরিণত করেছিলেন, দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করেছিলেন। কমরেড স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে পার্টির ২০তম এবং ২২তম কংগ্রেস শোধনবাদী রাজনীতির দ্বার খুলে দেয়। শোধনবাদের বিরুদ্ধে ২০তম কংগ্রেসের পর থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলে এসেছেন। শোধনবাদ যে বিপদ যে বিপর্যয় নিয়ে আসবে কমরেড শিবদাস ঘোষ তা অতিক্রমের পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ ব্যক্তিবাদের এই চরম প্রতিক্রিয়ার যুগে কীভাবে একটি সঠিক বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে হবে সে সম্পর্কে পথনির্দেশ করেছেন। আমরা বাংলাদেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা নিয়ে একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করছি। আমরা এখনও এতবড় হইনি কিন্তু সবরকম চেষ্টা করছি যাতে সকল রকমের শোধনবাদী চিন্তা এবং বিপ্লববিরোধী চিন্তার যে নানা ধরণের আক্রমণ, তা থেকে যাতে দলকে রক্ষা করা যায়। আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এস ইউ সি আই (সি)-কে একটা নেতৃত্বকারী পার্টি মনে করি। তাদের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যাব। আমাদের যে অভিজ্ঞতা সেগুলি আমরা বিনিময় করব। এইভাবে দুই দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির যে মৈত্রী তা দীর্ঘজীবী করার আমরা চেষ্টা করব। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র বন্ধন শক্তিশালী হোক, আমরা এই সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাই।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org